চাঁদমামা
জানুয়ারী ১৯৭৭
Rs 1·25

বিশ্বের বিস্ময়

বিশ্বের সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপ

উত্তর ককেসাস প্রান্তে নতুনভাবে বসানো এই 'রিফ্লেক্টিং' টেলিস্কোপের আয়নার ব্যাস ৬ মিটার বা ২৩৬ ইঞ্চি। (পালোমার টেলিস্কোপ আয়নার ব্যাস ২০০ ইঞ্চি)। এই টেলিস্কোপের মোট ওজন ৮৫০ টন। এটা হাজার কোটি আলোকবর্ষের দূরত্ব দেখতে পায়। এই টেলিস্কোপ এই বছরেই কাজ শুরু করেছে।
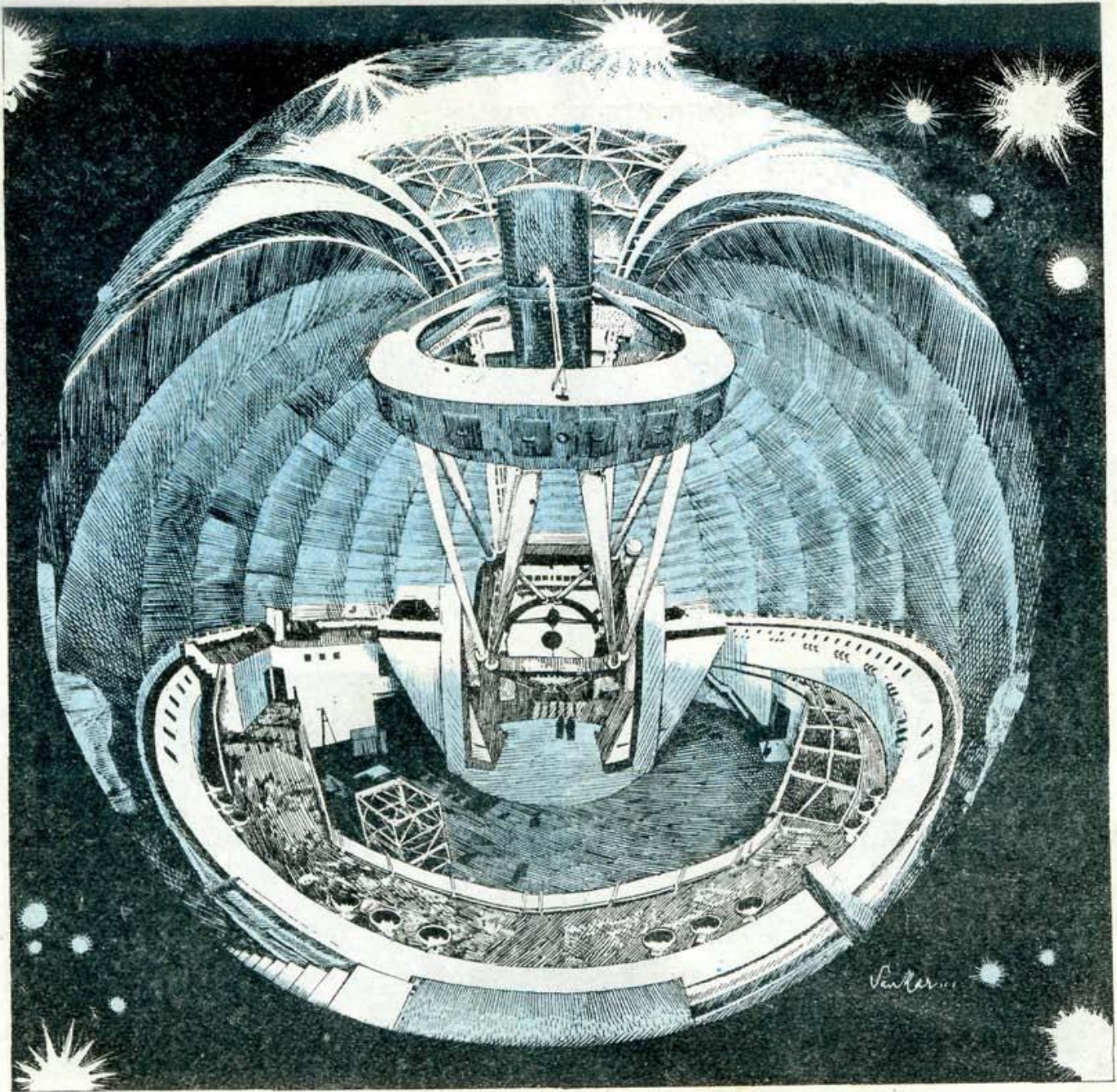
মায়া সরোবর

এগার

[জয়শীল বুঝতে পারল যে কণকাক্ষ রাজার ছেলে এবং মেয়েকে মকরকেতুই তুলে নিয়ে গেছে। তাকে ধরে চিকিৎসা করিয়ে সে রাজার কাছে নিয়ে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু পথে কয়েকজন ভীল বাধা দিল তাকে। কিছুক্ষণ পরে দশজন অশ্বারোহী এসে সবাইকে ঘিরে ফেলল। তারপর ......]

অশ্বারোহীদের দেখে জয়শীল সহজেই বুঝল যে ওরা কণকাক্ষ রাজার সেনা। তরবারি নামিয়ে জয়শীল ওদের বলল, "ঐ দেখ, ঐ যে কুমীর রূপধারী বিচিত্র হাতির পিঠে বসে আছে ও হল কণকাক্ষ রাজার বন্দী। ও যাতে পালিয়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।"

অশ্বারোহীদের নেতা মকরকেতু যে হাতির উপর বসেছিল সেই জলগ্রহ হাতিটিকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে অবাক হয়ে জয়শীলকে প্রশ্ন করল, "এ কি পিশাচ, দেবতা না দানব?"

"সেটাই তো প্রশ্ন। এ দেবতা নয়, দানব নয়। মানুষ নয় জন্তুও নয়। এখনও বুঝতে পারিনি।" জয়শীল বলল।

ইতিমধ্যে সিদ্ধসাধক, ব্যাধ ও গণা-

চারিকে আলাদাভাবে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে বলল, "ওহে, তোমরা ভুল করছ, ওকে তোমরা ভাবছ কালীভক্ত। ও কিন্তু কালীভক্ত নয়। ওর আচার-আচরণ সব কিছুর মধ্যে একটা মুখোশ আছে। আমি হলাম মহাভক্ত। ওকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তোমরা তীর চালাতে চাও, চালাও। তবে এমনভাবে চালাবে যাতে ওর বুকে তীরগুলো গেঁথে যায়। আমি এক, দুই, তিন বলব।"
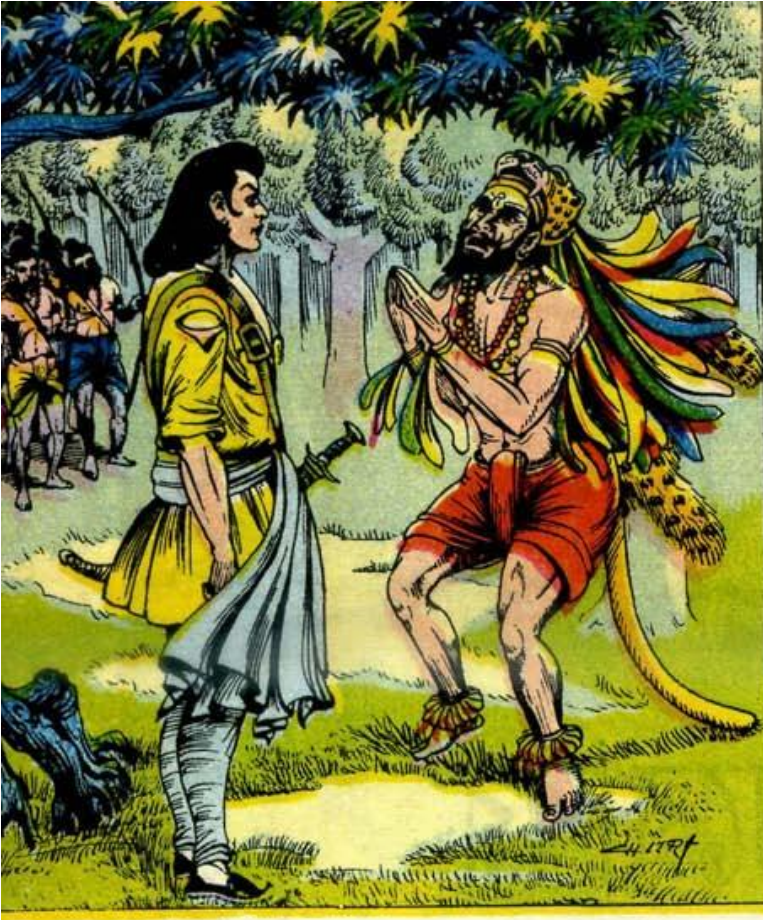
সিদ্ধসাধকের কথা শুনে ব্যাধেরা অবাক হল, কিছুটা ভয়ও পেল। দশজন কালো পোশাক পরা অশ্বারোহীকে দেখে ওদের ভয় আরও বেড়ে গেল। বিরাট দাড়িধারী সিদ্ধসাধক আর খাপ খোলা তরবারি হাতে জয়শীল-এরা সবাইকে এক দলের ভেবে ওদের ভয় বেড়ে গেল।

ব্যাধেরা বুঝল সিদ্ধসাধকের কথা না শুনে উপায় নেই। ওদের নেতা সবাইকে জিজ্ঞেস করল, "ওহে শোন, এখন কি করবে ভেবে দেখ? এই মন্ত্র দণ্ডধারী তান্ত্রিকের কথামত তীর ছুঁড়বে?"

"এতগুলো লোক আমরা বিপদে পড়তে যাবো কেন? কি বলেন গণাচারি?" একজন ব্যাধ জিজ্ঞেস করল।

এই প্রশ্ন শুনেই গণাচারি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে জয়শীলের কাছে প্রাণের ভয়ে গিয়ে বলল, "বাঁচান, আমাকে আমার দলের এই ব্যাধদের হাত থেকে বাঁচান। ওদের হাত থেকে তীর বেরিয়ে এলে আর আমার রক্ষে থাকবে না।"

"মৃত্যু তো হবেই। তরবারিতে হলেই বা কি আর তীর বিঁধে হলেই বা কি। মৃত্যুর হাত থেকে তোমার রেহাই নেই।" সিদ্ধসাধক রাগের স্বরে বলল।

ব্যাধেরা একসঙ্গে ধনুকে তীর চড়াল।

তীর ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুত হল। তৎক্ষণাৎ জয়শীল ওদের থামতে বলে সিদ্ধসাধককে বলল, "সাধক, তুমি যা করছ তা ভালো-ভাবে ভেবে করছ না। তুমি রাজা নও। রাজাই পারে মৃত্যুদণ্ড দিতে।"

জয়শীলের গম্ভীর গলা শুনে সিদ্ধসাধক থতমত খেয়ে বলল, "তুমি কি এসব সত্য সত্যই করব ভেবেছ জয়শীল? গণচারি-কে নিয়ে একটু ঠাট্টা তামাসা করছিলাম। এই অশ্বারোহীরা ঠিক সময়ে না এলে এই গণাচারি হয়ত তার জাতভাইদের দিয়ে আমাদের মেরে ফেলার চেষ্টা করত।"

এতক্ষণ যা ঘটছিল তা অশ্বারোহীদের নেতা দেখে জয়শীলকে জোড়হাত করে বলল, "আপনারই নাম কি জয়শীল? আমরা মন্ত্রীর কাছে আপনার নাম শুনেছি। আপনি নাকি রাজকুমার ও রাজকুমারীকে যারা নিয়ে গেছে তাদের ধরেছেন? আপনাকেই খুঁজছিলাম।"

"খুব ভালো হল অশ্বনেতা। আমরা গোটা অরণ্য খুঁজে এ লোকটাকে ধরেছি। লোকটাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে না? আমি, মানে সিদ্ধসাধক আর এই জয়শীল আমরা একসঙ্গে খুজে একে ধরতে

পেরেছি।" বলল সিদ্ধসাধক।

"লোকটাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। কাঁধে, পেটে, তীর তরতারি গেঁথে হাতির পিঠে বসে আছে। এ রকম দৃশ্য আমি দেখিনি। এমনভাবে বসে আছে যেন এগুলো তার অলঙ্কার।" অশ্বনেতা বলল।

"ওগুলো অলঙ্কার নয়। ওগুলো আছে বলেই সে মরে যাবে। আমি আর চর-কাচারি ওকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করব ভেবেছিলাম। আমার গ্রামের লোকের মুখেই মন্ত্রীমশাই সব খবর শুনেছেন।" হাতির আড়াল থেকে

বেরিয়ে এসে বীরনারায়ণ বলল।

আর বেশীক্ষণ সেখানে থাকা জয়শীলের কাছে নিরাপদ বলে মনে হল না। খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে মন্ত্রীকে সমস্ত জানানো উচিত। রাজার ছেলেমেয়েদের এখনও যে খুঁজে পাওয়া যায়নি, তা জানাতে হবে। মকরকেতু যাতে মরে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ও মরে গেলে রাজকুমার ও রাজকুমারীকে পাওয়া যাবে না।

জয়শীল এসব কথা ভাবতে ভাবতে মকরকেতুকে বলল, "কেতু তোমার আর কোন প্রাণের ভয় নেই। স্বয়ং কণকাক্ষ রাজা তোমার রক্ষনাবেক্ষণের ভার নিয়েছেন। স্বয়ং মন্ত্রী যখন কেতুর খবর রাখছেন তখন আর ভাবনার কিচ্ছু নেই।"

মকরকেতু একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "পেটে যে তরবারিটা আছে, তার চেয়ে কাঁধে যে তীর গেঁথে আছে সেটা বেশী কষ্ট দিচ্ছে। এই তীর যে ছুঁড়েছে সে আর একটু হলে আমার জলগ্রহের খোরাক হয়ে যেত। তবে ঐ যে একটু ধরেছে তাতেই হয়ত লোকটা মরে গেছে।"

জয়শীল তাড়াতাড়ি গিয়ে ভীমকে দেখল। তাকে দেখে মনে হল তার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। পেছনে পেছনে চরকাচারিও এল। সে পরীক্ষা করে দেখে বলল, "জয়শীল মশাই, এ তো বেঁচে আছে। নাড়ী চলছে।"

"সে কথা ঠিক। কিন্তু একে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে কি করে? ভালো হত, একে ওর জাতভাইদের হাতে যদি দেওয়া যেত।" জয়শীল বলল।

জয়শীলের কথা শেষ হতে না হতেই সিদ্ধসাধক ভীমের কানে মুখ রেখে চিৎকার করে বলল, "ওরে ভীম, এবার ওঠ। তুমি যে বুনো মুরগীটাকে মেরেছিলে

সেটা মন্ত্রীমশাই কুমীর-লোকটাকে খাওয়াবে ভেবেছিল। কিন্তু হঠাৎ সেটা নিয়ে গণাচারি ছুটে পালাচ্ছে।"

লাফিয়ে উঠে পড়ল ভীম। পালাতে যাবে এমন সময় অশ্বারোহীদের সে দেখতে পেল। দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "কই ভূতদের নেতা গণাচারি কোথায় ?"

সিদ্ধসাধক ভীমের কাঁধে হাত রেখে বলল, "ওরে ভীম, তুমি যে দেখেও দেখছ না। দেখ, তোমার গণাচারী কিনা ?"

সাধকের কথা শুনে ভীম তাকিয়ে দেখল। তার জাতভাইরা একধারে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। গণচারির দিকে তাকাতেই তার মুরগীর কথা মনে পড়ল।

"কোথায় ? আমার মুরগীটা কোথায় ? আমার মুরগী না দিলে আমি আস্ত রাখবো না। অনেক কষ্টে মুরগীটাকে মেরেছি। বলে ভীম পাথর তুলে গণা-চারির দিকে ছুটল।

গণাচারি চিৎকার করে বলল, "আমার এই লোকটার ঘাড়ে কুক্কুর পিশাচ ভর করেছে। বিড়াল মন্ত্র ছাড়া ঐ পিশাচ ছাড়বে না। ও যাকে তাকে মেরে দেবে।" গণাচারির সঙ্গে সকলে ছুটল।

"বেঁচে গেলাম জয়শীল মুক্তি পেয়েছি।" বলতে বলতে সিদ্ধসাধক হাসল।
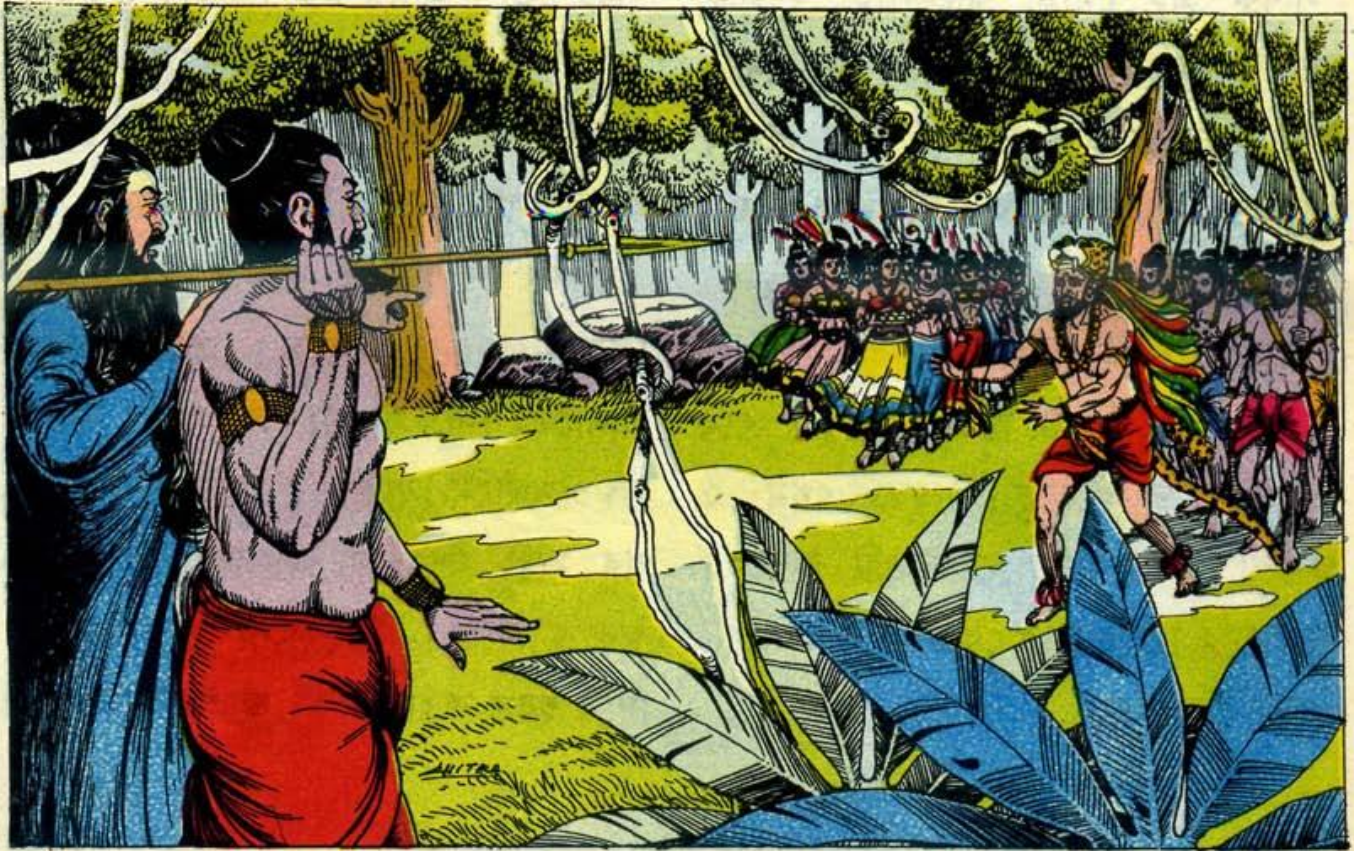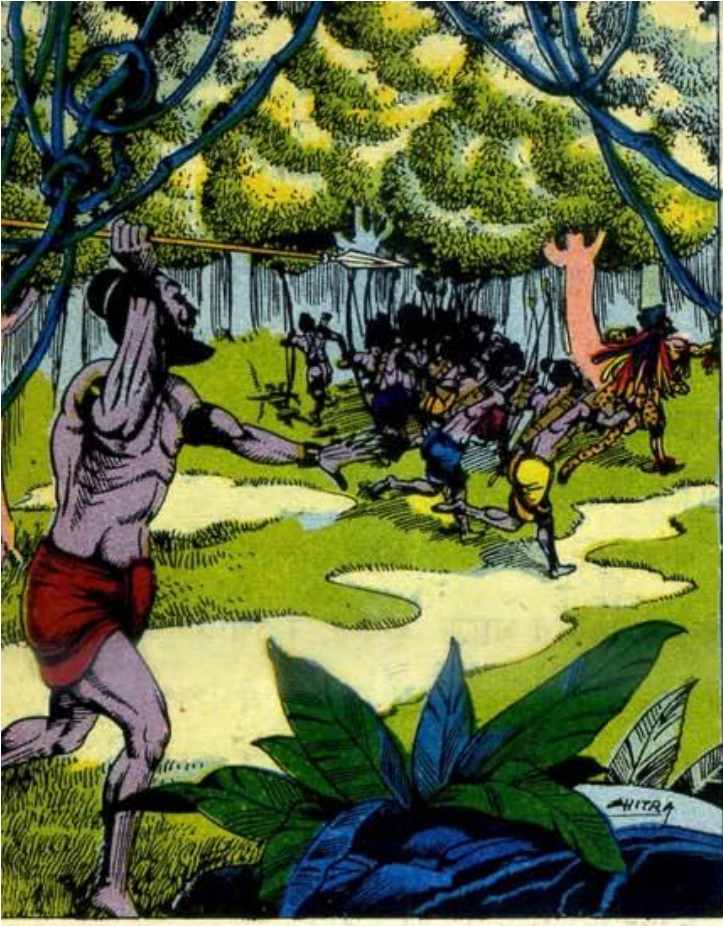
ওদের পালানো দেখে জয়শীল বলল, "সাধক এই গোটা ঝামেলাটা হয়েছে তোমার জন্য। লোকটা এটা-ওটা মেরে খিদে মেটাচ্ছিল। ওর নাম ছিল রাম। তুমি ওর বিরাট একটা নাম দিলে ভীম। সেও বীরপুরুষ সেজে ছোটাছুটি করছিল। যাক,এখন সবাই পালিয়েছে, বাঁচা গেল।"

"জয়শীল, কথাটা ঠিকই বলেছ। তবে একটা লাভ হয়েছে। ওরা এখন ঐ ক্ষ্যাপা ভীমের জন্যে ,ছোটাছুটি করবে। আমাদের দিকে আর কেউ আসবে না।" সিদ্ধসাধক বলল।

অশ্বনেতা বলল, রওনা হওয়া যাক।"

"ঠিক আছে।" বলে জয়শীল চরকাচারি ও বীরনারায়ণকে কাছে ডেকে বলল, "এবার তোমরা সামনে থাকো। খবর পেয়েছি মন্ত্রী মশাই সদলবলে তোমাদের গ্রামে এসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।"

"ওদের গ্রামের কাছেই সেনাবাহিনীর তাঁবু পড়েছে। আপনার দেখা পেলেই আমাদের উপর ভার ছিল আপনাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার।" বলল অশ্বনেতা।

জয়শীল সবাইকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করল, "কথাটা সকলের কানে গেছে তো ? এবার রওনা হওয়া যাক।"

চরকাচারি বলল, "তাহলে কুমীর লোকটাকে রাজ-বৈদ্য চিকিৎসা করবেন মন্ত্রীর সামনে ওর চিকিৎসা হবে ?"

"দেখ চরকাচারি, রাজার অশ্বারোহী সৈন্য এখানে এসেছে। ওদের কর্তব্য আমাদের নিয়ে যাওয়া। আমাদের কর্তব্য হল সেখানে যাওয়া। সেখানে যাওয়ার পর মন্ত্রী মশাই যা বলবেন তাই আমরা করতে বাধ্য। চিকিৎসা রাজবৈদ্যকে দিয়ে হয়ত করাবেন।" জয়শীল বলল।

"আজ্ঞে আমাদের একটা আশা ছিল। আমরা মন্ত্রীর সামনে চিকিৎসা করার সুযোগ পেলে তাঁর নজরে পড়তাম, তাতে আমাদের ভবিষ্যৎ ভালো হত।" চর-কাচারি বলল। ঘাড় নেড়ে বীরনারায়ণ সায় দিল।

"আচারি পদটা যে কিসের জন্য নামের সঙ্গে জোড়া হয়েছে জানি না। তবে মন্ত্রীর সামনে চিকিৎসা করার সময় যদি মকরকেতু মরে যায় তাহলে কিন্তু তোমরা দুজনে, যতবড় বৈদ্য হওনা কেন, শাস্তি পাবে। এটা মনে রেখো।" জয়শীল বলল।

"ওদের দুজনকে শাস্তি দেওয়ার ভার আমাকে দিও জয়শীল। আমার খুব ইচ্ছে এদের দুজনকে মহাকালের সামনে বলি দেওয়ার। বলি দিতে পারলে. শুধু আমাদের নয় জগতের মঙ্গল হবে জয়শীল।" বলল সিদ্ধসাধক।

"আর কথা নয়, এবার সবাইকে এগোতে হবে।" বলল জয়শীল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে পাহাড়ের কোলে, যেখানে মন্ত্রীর তাঁবু পড়েছিল, সেখানে সবাই পৌঁছে গেল। মন্ত্রী ধর্মমিত্র সকলের দিকে তাকিয়ে জয়শীলকে বলল, "রাজার পুত্রকন্যাকে উদ্ধারের সূত্র
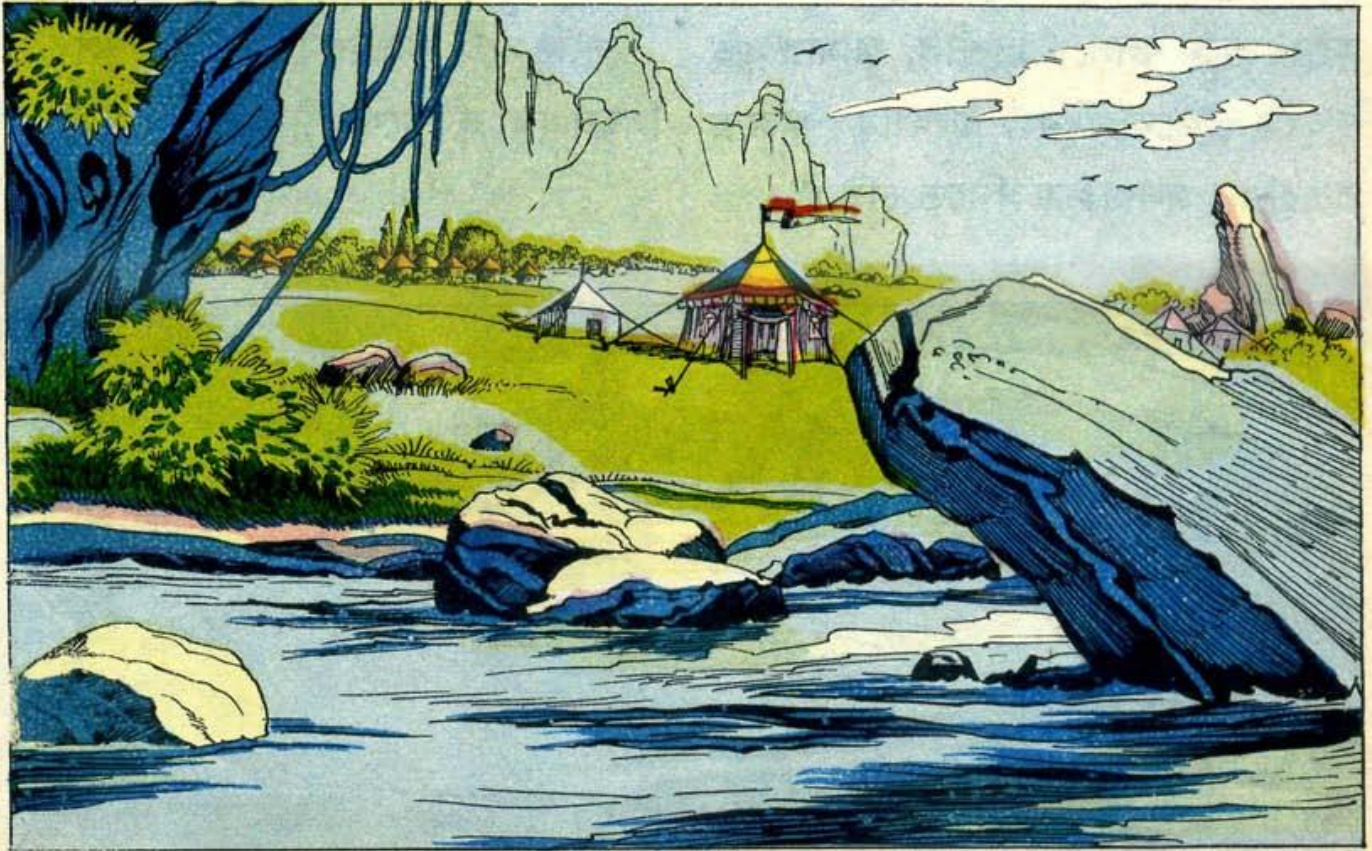
পাওয়ায় তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই দুরাত্মাটা কি ওদের কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, কিছু বলেছে ?"

জয়শীল সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বলে শেষে বলল, "মন্ত্রীমশাই প্রথমে এর শরীর থেকে ভাঙ্গা তরবারি, তীর ইত্যাদি বের করতে হবে। এগুলো বের করার পর তাকে প্রশ্ন করা সঠিক ও শোভন হবে।"

"ঠিক আছে তাই করা যাবে। তবে চিকিৎসার পর সে যদি মুখ না খোলে, আমাদের প্রশ্নের জবাব না দেয়, তাহলে কিন্তু হাতি দিয়ে মাড়িয়ে ওকে প্রাণে মেরে ফেলব।" মন্ত্রী বলল।

ওদের কথাবার্তা মকরকেতু কান খাড়া করে শুনে বলল, "জয়শীল, আমার এই জলগ্রহ অনেকদিন জলপান করতে পারেনি। জলখাইয়ে নিতে চাই।"

"তা করতে পার। তবে আমি এবং সাধক দুজনেই জলগ্রহের পিঠে, তোমার পেছনে বসে থাকব। তোমাকে বিশ্বাস নেই। তুমি যে কোন মুহূর্তে যাদুর খেলা দেখাতে পার।" বলে জয়শীল ও সিদ্ধসাধক উঠে তার পাশে বসল।

মকরকেতু জলগ্রহকে হেঁকে কাছে যে পুকুরটা ছিল সেই পুকুরে নেমে অনেকদূর চলে গেল। সেখানে মকরকেতু বলল, "জয়শীল, আমাকে তো মরতেই হবে। আগে আর পরে।" বলে, এক মুহূর্ত পরে চীৎকার করে বলল, "হে মায়া সরোবরেশ্বর!" তারপর জলগ্রহকে বলল, "জলগ্রহ, জলে পথ কর।"

সঙ্গে সঙ্গে জলগ্রহ পিঠে জয়শীল ও সিদ্ধসাধককে নিয়েই ডুবে গেল।

(আরও আছে)
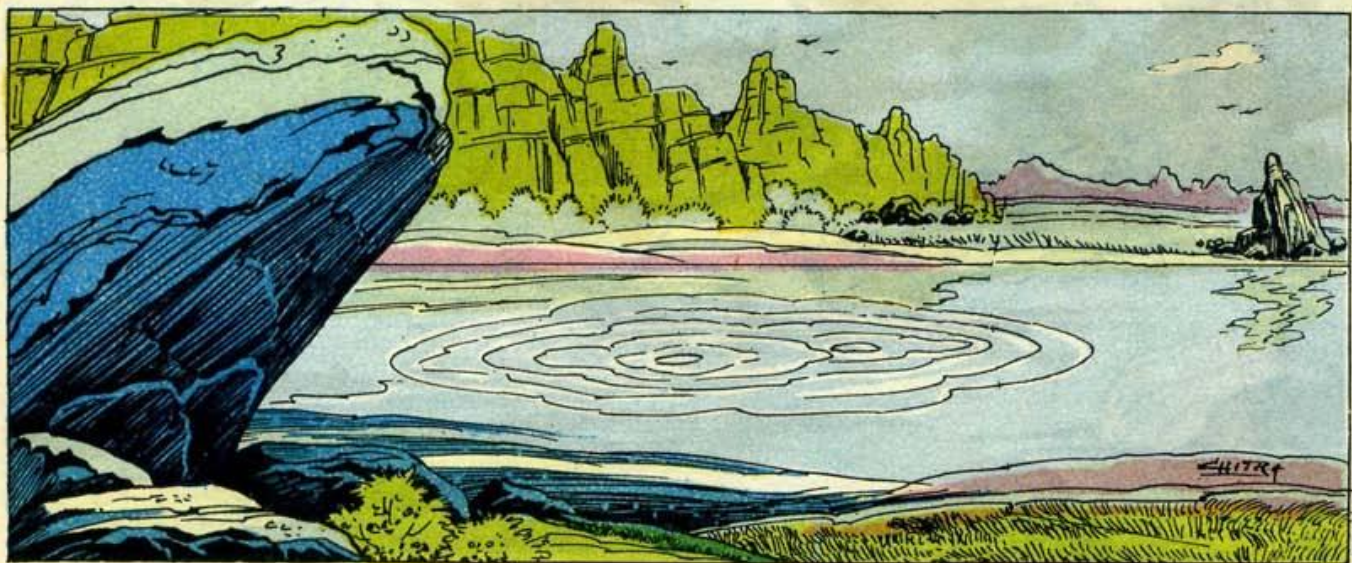
সাধুর কৌটো

নাছোড়বান্দা বিক্রমাদিত্য আবার সেই গাছের কাছে ফিরে গেলেন। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে নীরবে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, তুমি যে কোন্ দিকের পক্ষপাতিত্বের ফলে এত পরিশ্রম করছ আমি তা জানি না। তবে এটুকু জানি সংসারিক সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে যারা অরণ্যে তপস্যা করে তারাও পক্ষপাতহীন নয়। আমার বক্তব্যের সাক্ষীস্বরূপ একটি কাহিনী শুনলে তোমার পথ চলার পরিশ্রম লাঘব হতে পারে।" বলে বেতাল কাহিনী শুরু করে দিল ঃ

এক সময় ধনবর্মা ও ধীরবর্মা নামে

বেতাল কথা

দেশ এগিয়ে চলেছে

আরও স্বাচ্ছন্দ্য চাই, চাই আরও গতিবেগ...

ভারতীয় রেলপথে প্রত্যহ দশ হাজারেরও বেশি রেলগাড়ী চলাচল করে। এর মধ্যে আছে দূর-পথের যাত্রীদের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর 2,570 টি শোবার বগী। রেলগুলি সর্বত্র সময়মত চলাচল করছে। মালগাড়ীগুলি প্রতিদিন 5.5 লক্ষ টন পরিমাণ আবশ্যক মালপত্র বহন করছে।

আপনারা ভারতীয় রেলওয়েকে আরও ভালভাবে সেবা করতে সাহায্য করতে পারেন। বিনা-টিকিটের যাত্রীদের অবৈধ ভ্রমণ বন্ধ করুন; রেলের সাজ-সরঞ্জাম যাতে চুরি না যায়, সেদিকে কড়া নজর দিন।

দৃঢ় সংকল্প ও কঠোর পরিশ্রম—আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে

davp 75/455
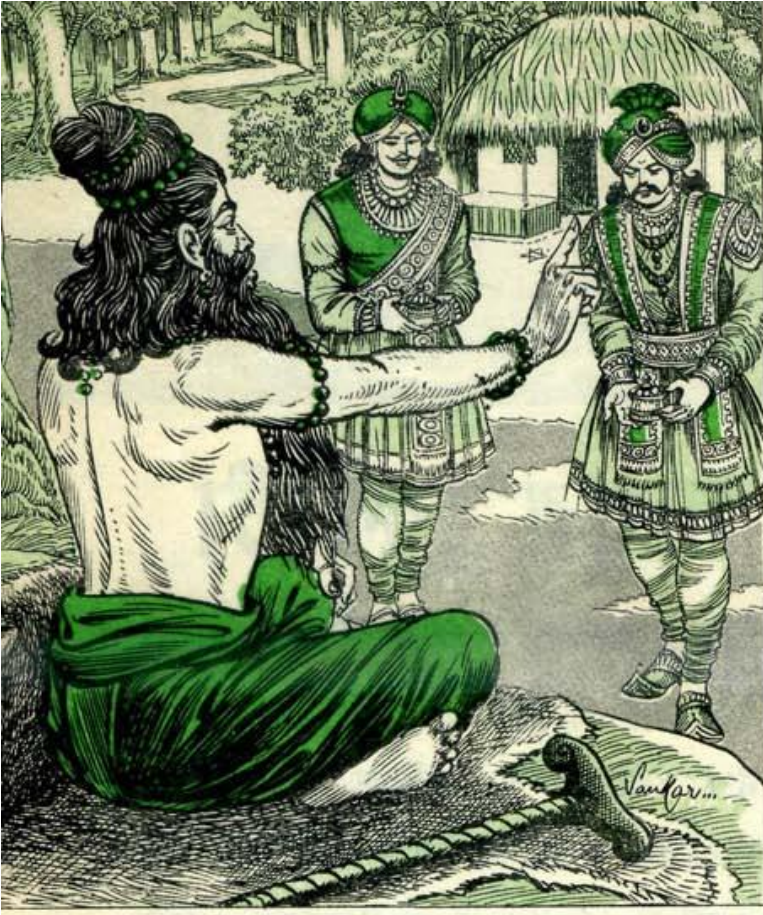
দুই রাজা পাশাপাশি রাজত্ব করছিল দুই দেশে। দুটো দেশের মাঝখানে একটা অরণ্য ছিল। সেই অরণ্যে জ্ঞানশেখর নামে এক সাধুর কুটির ছিল। সাধু তপস্যা করত। দু দেশেরই প্রজা ঐ সাধুর কাছে আসত। নিজেদের সমস্যার কথা বলত। শুনে সাধু যে পরামর্শ দিত সেই পরামর্শ অনুসারে ওরা কাজ করত।

সে বছর বর্ষা ভালোভাবে না হওয়ায় আকালের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। দুটো দেশেরই একই অবস্থা। একদিন ধনবর্মা ও ধীরবর্মা সাধুর কাছে পরামর্শ নিতে এল। ওদের বক্তব্য শুনে সাধু জ্ঞানশেখর বলল, "দেখ বাবা, তোমাদের দুজনকেই একটা করে কৌটো দিচ্ছি। যখনই তোমরা বিপদে পড়বে কৌটো খুলে দেখবে। তোমাদের সমস্যার সমাধান তোমরা তাতে খুঁজে পাবে। তবে একটু বুদ্ধি খাটাতে হবে। খুব ছোট ছোট সমস্যার সমাধান এতে খুঁজে পাবে না। এখন আমি কিছুকালের জন্য সমাধিস্থ হব।"

এইভাবে বলে সাধু দুই রাজাকে দুটো কৌটো দিয়ে দিল। রাজারা যে যার কৌটো নিয়ে নিজের নিজের দেশে ফিরে গেল।

ধনবর্মা আকালের সময় কি করা উচিত সে ব্যাপারে মন্ত্রী ও ব্যবসাদারদের সঙ্গে আলোচনা করে কোন সমাধান যখন খুঁজে পেল না তখন ঐ কৌটো খুলল। তাতে যে মূল্যবান অপূর্ব বস্তু ছিল। সেই বস্তু বিদেশে বিক্রি করে বিদেশ থেকে ধান আনিয়ে সে দেশের খাদ্যাভাব মেটাল।

কিন্তু ধীরবর্মা তা করল না। অভাব বা আকালের হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য সে কয়েকটা কাজ হাতে নিল। সেই কাজ করে ফল না পাওয়া গেলে

তখন কৌটো খুলে দেখা যাবে ভাবল। প্রথমেই সে চেষ্টা করল যাতে দেশের ধান দেশের বাইরে কেউ নিয়ে না যায়। ব্যবসাদারদের কাছে যত ধান ছিল সব ধান রাজা নিয়ে নিল। নিয়ে প্রজাদের মধ্যে বণ্টন করে দিল। ফলে সে বছর প্রজারা না খেতে পেয়ে মরে নি।

ধীরবর্মার চেয়ে সেবছর ধনবর্মা তার প্রজাদের অনেক ভালো খাইয়েছিল। তাই সে সগর্বে বলল, "আমার দেশের প্রজা এই বছর সবচেয়ে ভালো খেতে পেয়েছে। আশেপাশের কোন প্রজা এত খেতে পায় নি। কোন রাজা প্রজাদের এত ধান খেতে দেয় নি। আগামী বছর আমি প্রজাদের আরও বেশী করে খাওয়াতে চাই আরও ভালো রাখতে চাই। মন্ত্রীগণ, বলুন, কিভাবে তা সম্ভব হবে।" মন্ত্রীরা কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "মহারাজ, গত বছরের মত আপনি সাধু জ্ঞানশেখরের ঐ কৌটো খুলুন।"

ধনবর্মা মন্ত্রীদের পরামর্শে সেটা খুলে দেখতে পেল একটি কাগজ তাতে শুধু লেখা আছে "জাগো, দেখ।"

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই এক
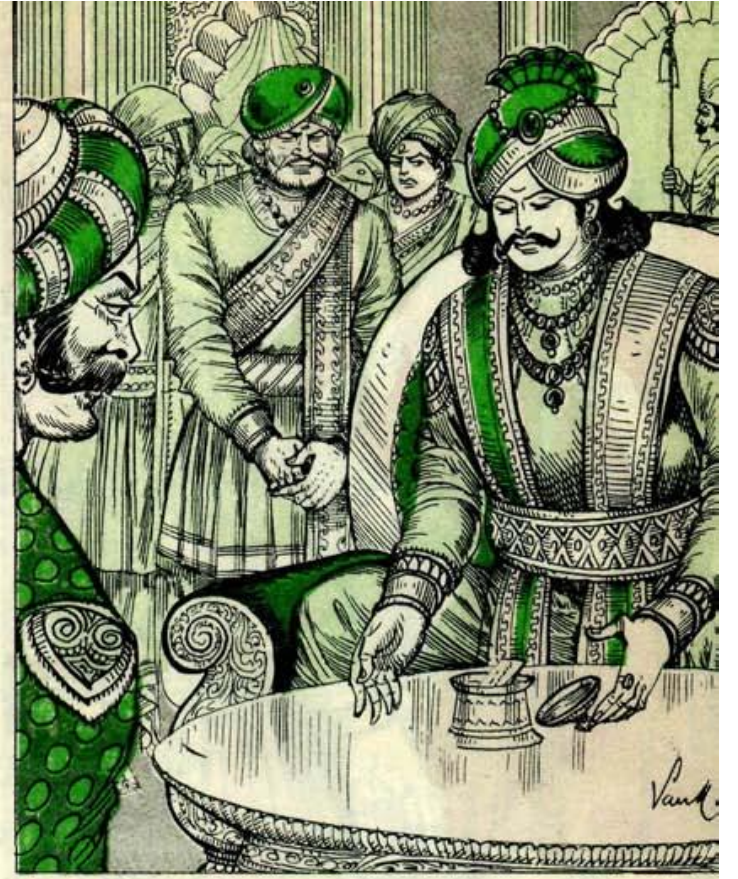
সাধু ধনবর্মার সঙ্গে দেখা করতে এসে তাকে বলল, "মহারাজ, আমার কাছে একটি যন্ত্র আছে। ঐ যন্ত্র দিয়ে ভূগর্ভে কোথায় কত সম্পদ আছে তা জানা যাবে। আমি এই যন্ত্র দিয়ে যেখানে দেখাব সেখানে খুড়ে দেখুন সম্পদ পাবেন। এভাবে খুড়ে খুঁড়ে আপনি আপনার দেশে অনেক সম্পদ মাটির তলা থেকে তুলতে পারবেন। তবে যত সম্পদ উঠবে তা বিক্রি করে যত পাবেন তার অর্ধেক আমাকে দিতে হবে।" রাজা তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল। তারপর

ঐ সাধুর যন্ত্রের সাহায্যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় খোঁড়া শুরু হয়ে গেল। মাটির তলা থেকে অনেক সোনা, রূপা, তামা, লোহা প্রভৃতি পাওয়া গেল। বিক্রি করে অর্ধেক দাম সাধুকে রাজা দিয়ে দিল।

দেখাদেখি ধীরবর্মার মন্ত্রীরা রাজাকে উপদেশ দিল জ্ঞানশেখরের কাছে আনা কৌটোটা খুলতে। কারণ ঐ কৌটো খুলে পাশের দেশের রাজা ধনবর্মা নিজের দেশের অনেক উন্নতি করেছে।

কিছুদিন পরে যে সাধু যন্ত্র নিয়ে ধনবর্মার দেশে গিয়েছিল সেই সাধু ধীরবর্মার কাছেও এল। ধনবর্মাকে যেভাবে যা বলেছিল ধীরবর্মাকেও তাই বলল। তার কথা শুনে ধীরবর্মা বলল "দেখুন, আপনি যদি আপনার যন্ত্র বিক্রি করতে চান আমি সানন্দে আপনার যন্ত্র কিনে নিতে পারি। কিন্তু আপনাকে নিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গার মাটি খুঁড়ে, দেশের সমস্ত সম্পদ বের করে আপনাকে তার অর্ধেক দিতে রাজী নই।"

এই ধরণের যন্ত্র আমার কাছে ছাড়া পৃথিবীতে আর কারও কাছে নেই। তাই এটা আমি বিক্রি করতে চাইনা। আমার স্বার্থে আপনি রাজী হলেন না; তবে মনে রাখুন, এই যন্ত্র ছাড়া মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে বিভিন্ন জায়গার সম্পদ বের করতে আপনার পঞ্চাশ বছর লেগে যাবে। আপনার দেশ পেছিয়ে যাবে।"

কিছুকাল পরে জ্ঞানশেখর সমাধি থেকে উঠে আশেপাশের কোন্ দেশের কি অবস্থা জানার জন্য বেরিয়ে পড়ল। ধীর-বর্মা জ্ঞানশেখরকে জানাল, "নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে যতটা পেরেছি সমস্যার সমাধান করেছি। আপনার কৌটো আমি এখনও খুলিনি।"

তারপর জ্ঞানশেখর গেল ধনবর্মার কাছে। সে বলল, "দেখুন, আমি আমার প্রজাদের কত ভালো রেখেছি। যখনই প্রয়োজন বোধ করেছি কৌটো খুলেছি।"

জ্ঞানশেখর ধীরবর্মার কাছ থেকে কৌটোটা ফিরিয়ে নেয় নি। কিন্তু ধনবর্মার কাছ থেকে কৌটোটা ফিরিয়ে নিল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যকে বলল, "রাজা, জ্ঞানশেখর এক রাজার কাছ থেকে কৌটোটা ফেরত নিল অন্য রাজার কাছ থেকে নিল না। এর কারণ কি? নিশ্চয় ধীরবর্মার প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব ছিল। ঐ কৌটোর ক্ষমতা কি শেষ হয়ে গিয়েছিল? আমার প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

বেতালের প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, "জ্ঞানশেখর কৌটো ফেরত নিল ধনবর্মার কাছ থেকে। কারণ ধনবর্মা সাধুর দুটো কথাই রাখলেন না। তিনি পর পর দুবার ঐ কৌটোটি খুলেছিলেন। যে সমস্যা দেখা দিল তার সমাধান করার উপায় রাজা ভাবেন নি। কৌটো খুলে সমস্ত সম্পদ বিক্রি করে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী ধান কিনে অপচয় করেছিলেন। দ্বিতীয় অপরাধ করেছিলেন মাটির তলার সমস্ত সম্পদ তুলে, শেষ করে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য মাটির তলায় কিছুই রাখলেন না। কিন্তু ধীরবর্মা ঐ কৌটো বা যন্ত্রের উপর নির্ভর করেননি। বুদ্ধি খাটিয়ে সমাধান করেছেন। তাই সাধু তা রেখে দিল।"

রাজার মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে গেল সেই গাছে। (কল্পিত)

বুদ্ধিমান চাকর

কোন এক গ্রামে এক ধনীর মেয়ের বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল। শুধু বাকী ছিল শহর থেকে স্যাকরার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকার সোনার গহনা আনা। কিন্তু ধনীর গ্রাম এবং ঐ শহরের মাঝে বনে ভীষণ চোর ডাকাতের উপদ্রব ছিল।

ধনী লোকটা দুশ্চিন্তায় পড়ল। বিয়ের দিন এগিয়ে এল। ধনী লোকটার এক বিশ্বাসী চাকর ছিল। নাম চন্দ্রশেখর। সে বলল, "আপনি যদি অভয় দেন স্যাকরার কাছ থেকে আমি গহনাগুলো আনতে পারি। আপনি গেলে ওরা হয়ত আপনাকে রেহাই দেবে না। আমাকে সন্দেহ করবে না।"ধনী লোকটা রাজী হয়ে গেল।

যাওয়ার সময় চারজন চোর চন্দ্রশেখরকে ঐ বনে ধরে জানতে চাইল, ও কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে। চন্দ্রশেখর ওদের বলল, "শহরে যাচ্ছি। দশ হাজার টাকার গহনা নিয়ে কালকে ফিরব।"

পরের দিন চন্দ্রশেখরকে ফিরতে দেখে ঐ চারজন ওকে ঘিরে ধরলে সে বলল, "স্যাকরা আমাকে দিল না। সে বলল পথে চোর ডাকাতের ভয় আছে। তুমি একা, প্রাণের ভয় আছে। অন্তত চারজন লোক তোমার সঙ্গে না থাকলে এত গহনা তোমাকে দেবনা।... এখন তোমরা যদি আমার সঙ্গে আস গহনাগুলো পেতে পারি।"

ঐ চারজন খুব খুশী হয়ে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে গিয়ে হঠাৎ রাজপ্রহরীদের হাতে ধরা পড়ল। ফলে ঐ অঞ্চলে আর চোর ডাকাতের ভয় রইল না।
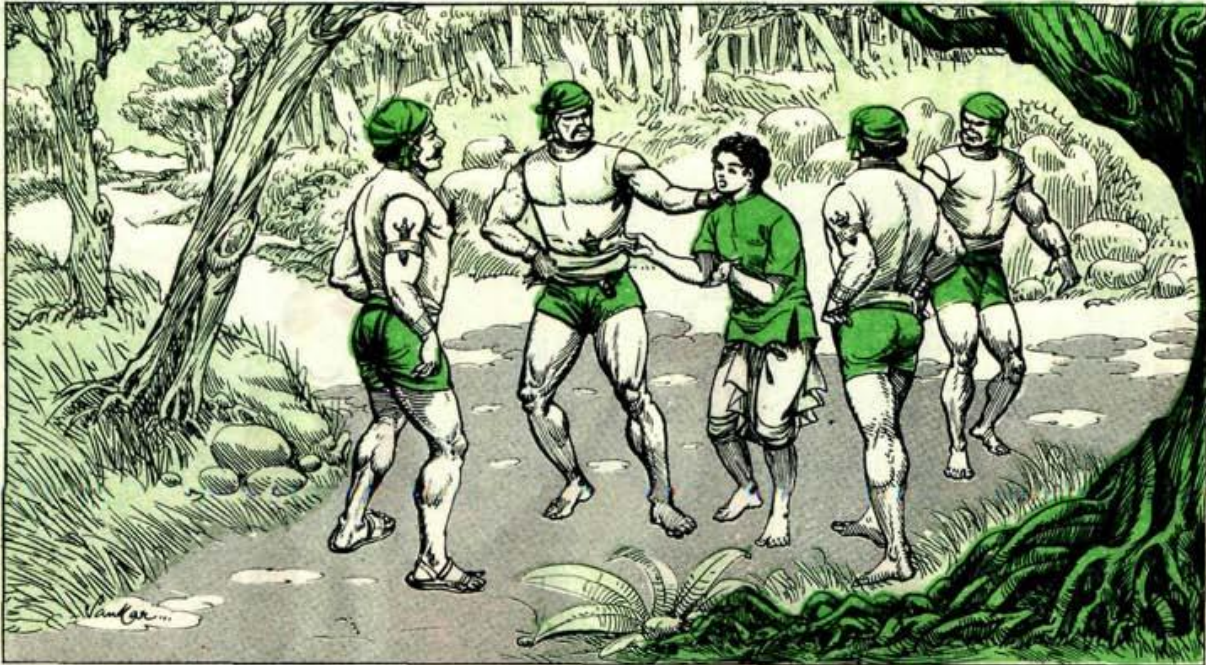
সেনাপতির ভাগ্য

"জয় হোক, জয় হোক, মহারাজের জয় হোক! আমাদের সেনাপতি বিক্রমজিৎ যুদ্ধে জয়ী হয়ে, পান্না রাজাকে পরাজিত করে, বন্দী করে রাজধানীতে আসছেন।" বলল বার্তাবাহক মহারাজ জয়ন্তকে।

জয়ন্ত বললেন মহানন্দে, "ওহে তোমরা জয়ধ্বনি কর, বিজয় তোরণ তৈরি কর।"

"কিন্তু মহারাজ, একটা বিষয় আপনাকে জানাতেই হবে, বুঝতে পারছি না কিভাবে তা জানাব।" দূত সবিনয়ে বলল।

"ভয় নেই, বল। যুদ্ধের আর কি খবর আছে?" রাজা অভয় দিয়ে স্বাভাবিক স্বরে জানতে চাইলেন।

"যুদ্ধে সেনাপতির বাঁহাতের মাঝের আঙুল কেটে গেছে।" সে বলল।

শুনে মহারাজ কপালে হাত রেখে সিংহাসনে কাত হয়ে পড়লেন। খবরটা খুব দুঃখের। যুদ্ধ করে যে সেনাপতি জয়ী হয়েছে, নিয়ম অনুসারে, এই আঙুল কেটে যাওয়ার ফলে সে তো আর সেনা-পতির পদে থাকতে পারবে না! সেই দেশের নিয়ম অনুসারে যে কোন ক্ষত থাকলে সেনাপতি হতে পারে না।

বিক্রমজিৎ, জয়ন্ত এবং প্রধান মন্ত্রীর ছেলের মধ্যে কৈশোর থেকে বন্ধুত্ব ছিল।

এই ঘটনার ফলে রাজা জয়ন্তর মন ভেঙ্গে গেল। দেশ শাসনের ভার প্রধান

এ. সি সরকার (যাদু সম্রাট)
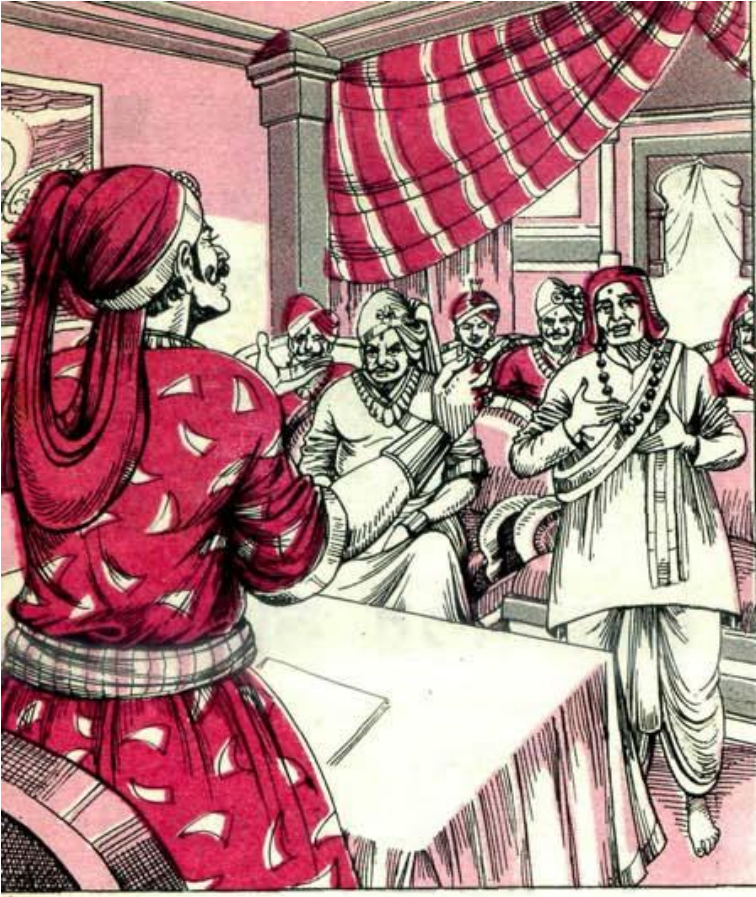
মন্ত্রীর হাতে দিয়ে রাজা অন্তঃপুরে শুয়ে বসে কাটাতে লাগালেন।

বিক্রমজিৎ রাজার সঙ্গে দেখা করে বলল, "অত দুশ্চিন্তার কি আছে? পদ আমার না-ই বা রইল আমি সারাজীবন আপনার সঙ্গেই থাকব।"

"কি লাভ হবে? সেনাপতির পদে তো আর থাকতে পারবে না। আমাদের দেশের এই নিয়ম আমার হাত-পা বেঁধে ফেলেছে। এই অবস্থায় আমার সিংহাসনে বসা না বসা একই কথা। আমার এই সিংহাসন অলঙ্কৃত করে কি লাভ?"

এই ধরণের নানা কথা তিনি মাঝে মাঝে আপন মনে বলে যেতেন। চিকিৎসকেরা এসে তাঁর শরীর ও মনের অবস্থা পরীক্ষা করে দেখল। দেখেশুনে ওরাও দুশ্চিন্তায় পড়ল। বিক্রমজিৎ যতদিন না সেনাপতির পদে বহাল হচ্ছেন ততদিন রাজার এই অসুখ সারবে না।" প্রধানমন্ত্রী অন্য মন্ত্রীদের বলল।

"কিন্তু তা কি করে সম্ভব? অনাদি-কাল থেকে আমাদের দেশের এই নিয়ম চলে আসছে। বিক্রমের ঠাকুর্দার বাবা একই কারণে ঐ পদ থেকে সরে যেতে বাধ্য হলেন। বিক্রমের ঠাকুর্দার চোখ যুদ্ধে বিক্ষত হওয়ায় ঐ পদ ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। তবে শুনেছি বিক্রমের ঠাকুর্দার বাবার বাবার যুদ্ধে কান কেটে গেলেও কোন এক দৈব বিধান অনুসারে সেনাপতির পদে বহাল ছিলেন। বলল শাসনমন্ত্রী।"

"তাই নাকি!" সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করল, "কি ভাবে তা সম্ভব হল?"

কি ভাবে এবং কোন্ দেবতার বিধান অনুসারে যে তিনি ঐ পদে বহাল ছিলেন তা শাসনমন্ত্রী জানাতে না

পারলেও তিনি যে ঐ পদে ঐ ঘটনার পর বহাল ছিলেন, তার প্রমাণ দলিল দস্তাবেজে পাওয়া যায়।

"তাহলে আজকেই বা দেবতার বিধান পাওয়া যাবে না কেন?" রাজপুরোহিত প্রশ্ন করল।

"বেশ, তাহলে দেবতার বিধান যাতে পাওয়া যায় তার জন্য যা করা প্রয়োজন তা আপনি করুন।" বলল প্রধানমন্ত্রী।

এক কোণে বসেছিল রাজ প্রাসাদের যাদুকর ভাস্কর। রাজপুরোহিত তার দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে সে চোখের ইশারা করল। তখন পুরোহিত ঐ দায়িত্ব নিতে সানন্দে রাজী হয়ে গেল।

পরে ভাস্কর পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করে তার পরিকল্পনা গোপনে তাকে জানিয়ে দিল।

পরের দিন রাজপুরোহিত রাজ-সভায় গিয়ে বলল, "আমি দেবতার সামনে ধ্যানে বসেছিলাম। দেখতে পেলাম, ঐ কাটা আঙুল একটি কাক এনে মন্দিরে ফেলে গেছে। আঙুলের টুকরোটা নড়ছিল। যেহেতু সেটা নড়ছিল
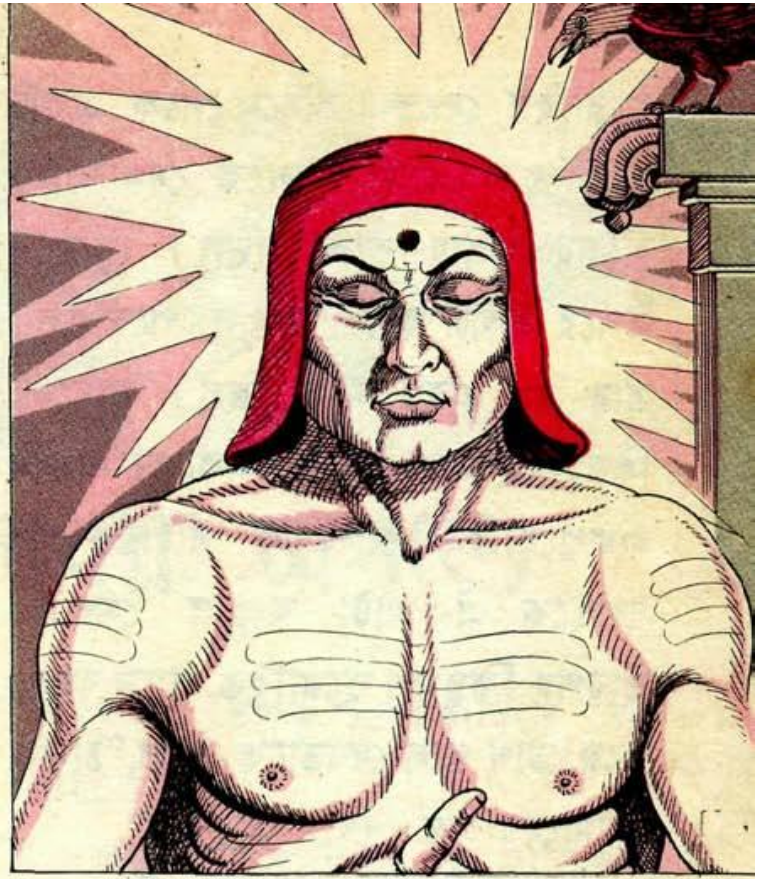
সেইহেতু প্রমাণ হয় যে দেবতার বিধান রাজার ইচ্ছার অনুকূলে।"

"সেই আঙুলটা যদি থাকে, আমরা কি তা দেখতে পাবো?" প্রধানমন্ত্রী পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করল।

"মহারাজ যদি তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে আজ সন্ধ্যায় মন্দিরে আসেন দেখতে পাবেন।" বলল রাজপুরোহিত।

সেদিন সন্ধ্যায়, রাজা, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য অনুচর সহ মন্দিরে গেলেন। সবাই বসে ঐ কাটা আঙুল দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

পুরোহিত দেবতার সামনে থেকে একটি ছোট বাক্স এনে রাজাকে দেখালেন। বাক্সের তলায় তুলো ছিল। তুলোর উপরে একটি কাটা আঙুল পড়েছিল। তার রং একটু নীল ছিল। সামনের দিকটা ছিল একটু সাদা। সকলের সামনে রাজপুরোহিত বাক্সটাকে বাঁহাতে ধরে সবাইকে ঐ কাটা আঙুল দেখাল। তারপর কিছুক্ষণ পুরোহিত ধ্যানে বসল। পরে চোখ খুলে দেবতাকে বলল, "ঠাকুর, আমাদের পথ দেখাও ঠাকুর।"

সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের ঐ আঙুলটি কয়েকবার নড়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ পুরোহিত একা দেবতার পেছনের দিকে ঐ বাঁ হাতেই বাক্সটা নিয়ে চলে গেল।

দেববিগ্রহের পিছনে ঘাপটি মেরে বসেছিল ভাস্কর। সে পুরুতঠাকুরের বাঁ হাত থেকে বাক্সটা আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে নিল। এই আস্তে আস্তে টেনে নেওয়ার কারণ ছিল। ঐ বাক্সের তলায় পুরোহিতের বাঁহাতের মাঝের আঙুলটি ঢোকার মত ফুটো করা ছিল। তলার সেই ফুটো দিয়ে পুরোহিতের আঙুলটা ঢুকিয়ে আশেপাশে তুলো রাখা ছিল।

সচক্ষে এই দৃশ্য দেখার ফলে সবাই একবাক্য রাজী হয়ে বলল, "বিক্রমজিৎকেই যাতে সেনাপতির পদে বহাল রাখা হয় তারই নির্দেশ দেবতার কাছ থেকে পাওয়া গেছে।" সকলের মত অনুযায়ী বিক্রমজিৎ সেনাপতির পদে বহাল রইল। রাজা সেরে উঠলেন। সারা দেশে বিজয় উৎসব পালিত হল। পান্নারাজা রাজা জয়ন্তর অধীনে থাকতে রাজী হওয়ায় তাকে মুক্তি দেওয়া হল।
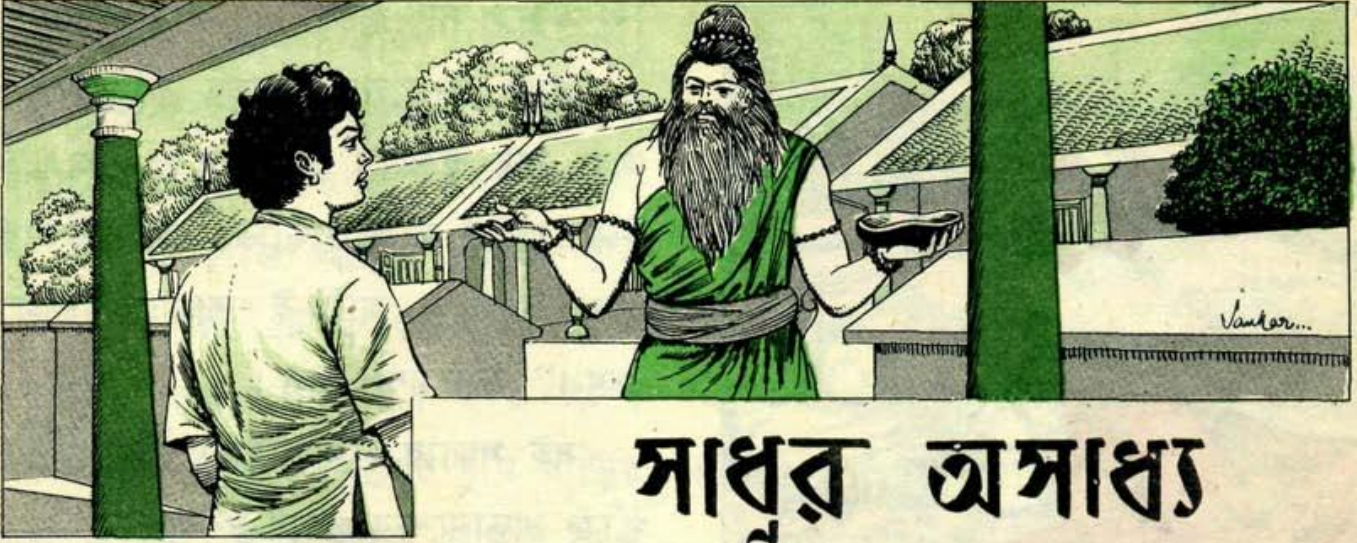
সাধুর অসাধ্য

বীরবর গ্রামে মদনমোহন নামে একজন লোক ছিল। তার ছিল দুই ছেলে। বড় ছেলের নাম হরি। বয়স হবে কুড়ি। পরেরটি দু বছরের ছোট। লেখাপড়ায় হরির মন বসল না। সাধারণ জ্ঞানেরও অভাব ছিল তার। কোন কাজেই তার উৎসাহ ছিল না।

দ্বিতীয় ছেলেটির নাম গিরি। লেখা-পড়া শিখে সে বাড়ি ফিরে এল। সবাই গিরিকে প্রশংসা করল। ঘরে বাইরে গিরি সমাদর পেল। পাশাপাশি হরি যে কোন কাজের নয়, লেখাপড়া করেনি, মূর্খ ইত্যাদি লোকে বলাবলি করতে লাগল। ওসব শুনে হরির ভীষণ বিরক্তি জাগল। এমন সময় একদিন শ্রদ্ধানন্দ নামে এক ভিক্ষুক ওদের বাড়িতে ভিক্ষে চাইতে এল।
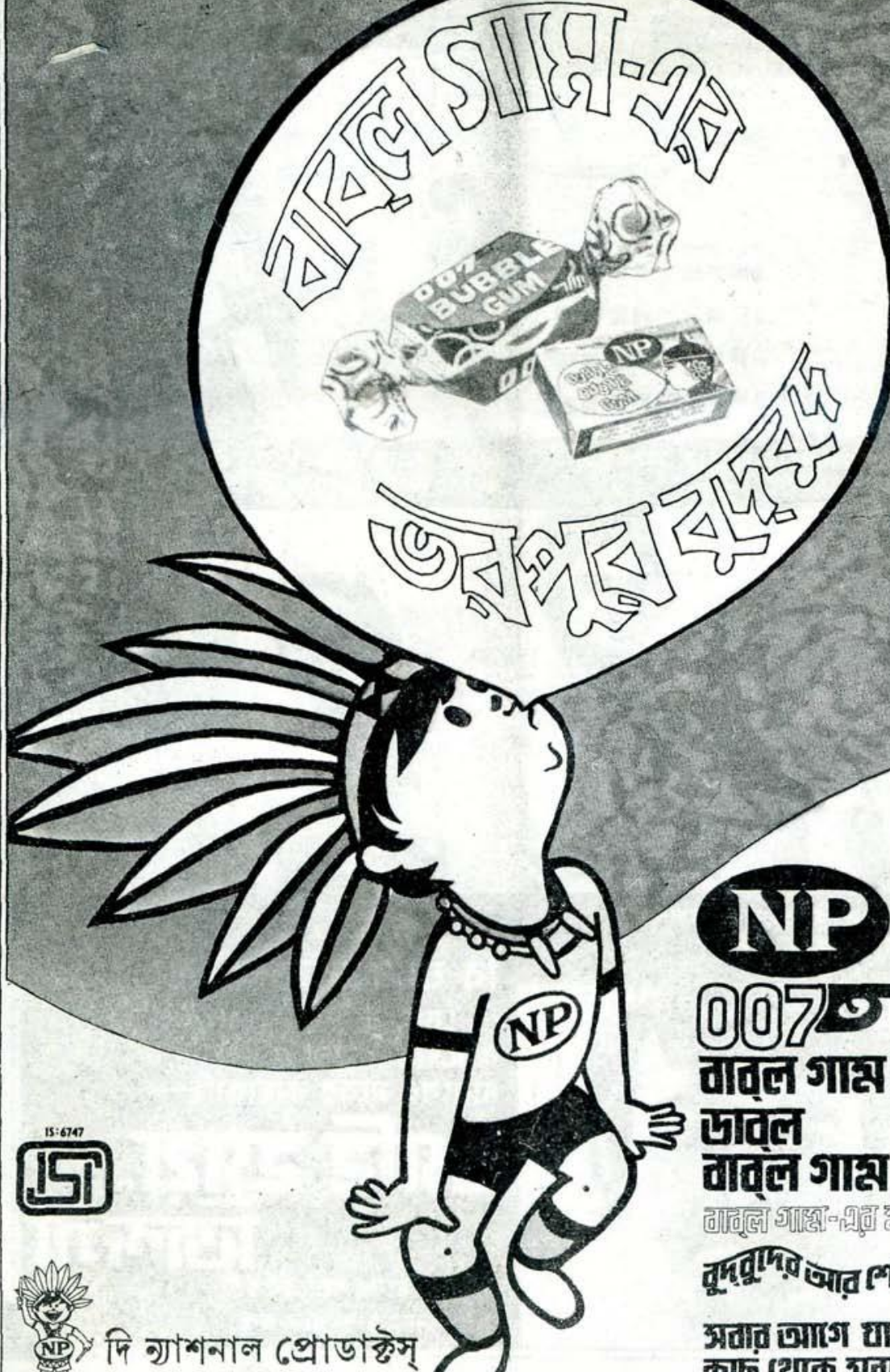
শ্রদ্ধানন্দ সাধু ছিল। কাছের একটি পাহাড়ের গুহায় সে থাকত। গ্রামের সবাই তাকে সম্মান দিত। প্রত্যেক দিন একবার সে ভিক্ষে করতে বেরুত। প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে সে মাত্র কিছুক্ষণ দাঁড়াত, যে যা দিত, নিয়ে চলে যেত।

বাড়িতে সকলেরই কাজ আছে। কাজ নেই হরির। নেই মানে করে না। তাই ভিক্ষুক এলে সেই ভিক্ষে দিতে এগিয়ে আসত। সেদিন সে শ্রদ্ধানন্দকে খুশী খুশী দেখে তাকে বলল, "আপনাকে আজকে খুব আনন্দিত দেখাচ্ছে; কারণ কি বলতে পারেন?"
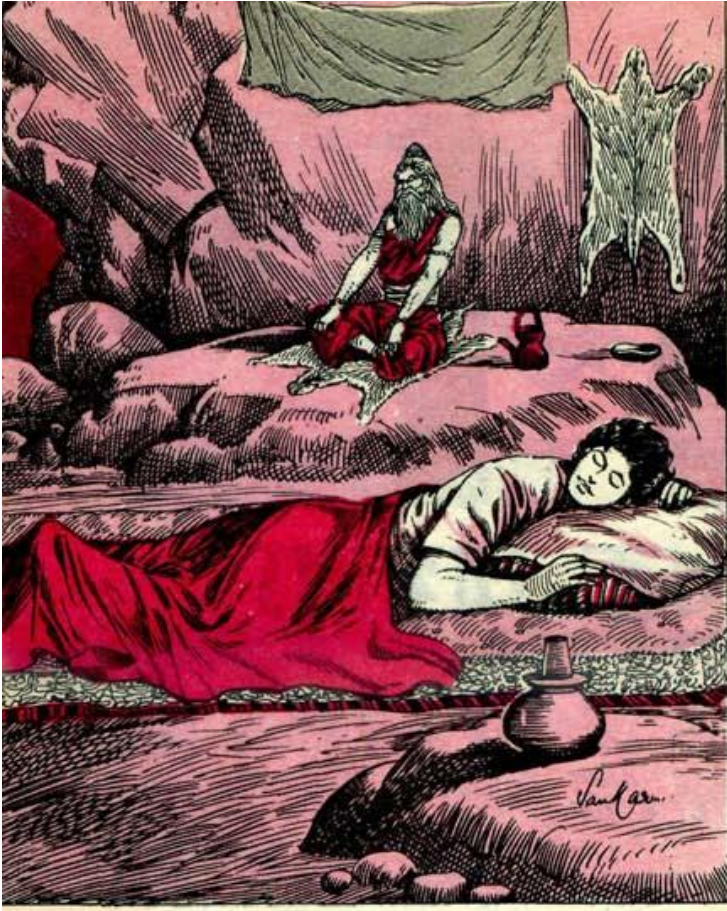
শ্রদ্ধানন্দ হেসে বলল, "আমার তো নিজের বলতে কিছুই নেই। আমার দুঃখ পাওয়ারও কিছু নেই। আমি সদাই আনন্দিত।"

হরির মাথায় একটা বুদ্ধি জাগল। সে ভাবল, তাহলে তো সাধু হওয়াই সহজ। সে যদি সাধু হয় তার কোন দুঃখ থাকবে না। লোকে তাকে সম্মান করবে। তার মনে সব সময় আনন্দ থাকবে।

এই কথা ভেবে হরি ঐ সাধুকে বলল, "প্রভু, আমারও ইচ্ছা করছে সাধু হতে। কি করলে সাধু হওয়া যায় জানাবেন?"

"বয়স তো তোমার বছর কুড়ি হবে। অত সাধু হওয়ার শখ কেন? খুব যদি ইচ্ছা জাগে আজ সন্ধ্যার সময় আমার গুহায় এসো। আমি-ই তোমাকে দীক্ষা দেব।" শ্রদ্ধানন্দ বলল।

সেই সন্ধ্যায় হরি পাহাড়ে উঠে খুঁজে খুঁজে শ্রদ্ধানন্দের গুহায় ঢুকল।

শ্রদ্ধানন্দ তাকে দেখে বলল, "এসে গেলে! সাধু হওয়ার অর্থ কি জানো? ত্যাগ করা। সম্পর্ক ত্যাগ করা। বাবা-মা আত্মীয় স্বজন সবাইকে ত্যাগ করা। নিজের সম্পত্তি বিসর্জন দেওয়া। আমার বলে কোন কিছু থাকবে না। জগতে কোন কিছুর সঙ্গে তোমার বাঁধন থাকবে না।"

হরি তার পায়ে পড়ে বলল, "প্রভু, আমি একজন অতি সাধারণ ছেলে। একদিনে সবকিছু ত্যাগ করতে পারবো না। তবে জীবনের উপর আমার বিরক্তি ধরে গেছে। সকলের মত, একভাবে বাঁচার আমার ইচ্ছা নেই। আপনার সেবা করতে করতে আমি একটা একটা করে সব ত্যাগ করব।"

শ্রদ্ধানন্দ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, "ত্যাগের একটা পদ্ধতি আছে। আস্তে আস্তে আমি তোমাকে তা শিখিয়ে দেব।"

"বাড়ির প্রতি আমার কোন টান নেই।" আমি এই মুহূর্তে বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারি।" হরি বলল।

"তাহলে আজকে থেকেই তুমি বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে আমার সঙ্গে থাক।" বলল শ্রদ্ধানন্দ।

তার মুখে বেদ বেদান্তের বাণী শুনতে শুনতে হরি সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। হরি বাড়ি ফিরছে না দেখে সবাই ঘাবড়ে গেল। পরের দিন শ্রদ্ধানন্দ হরির বাড়িতে ভিক্ষে করতে গেল। ওদের বাড়িতে সবাইকে মন মরা দেখে সে বলল, "হরি আমার গুহায় আছে।"

শুনে সবাই অবাক। ঘটনা শোনার পর হরির বাবা মদনমোহন বলল, "সে কি! আমার ছেলে সাধু হবে মানে? ওর কিসের অভাব?"

"তা জানি না। তবে ওর নাকি জীবনের উপর বিরক্তি ধরে গেছে। ওর এই মনের অবস্থা থাকবে কি না তা আমি জানিনা। ওকে এক্ষুনি আপনারা ডাকলে ও আপনাদের সঙ্গে বাড়ি ফিরবে বলে মনে হয় না। তবে মঝে মধ্যে
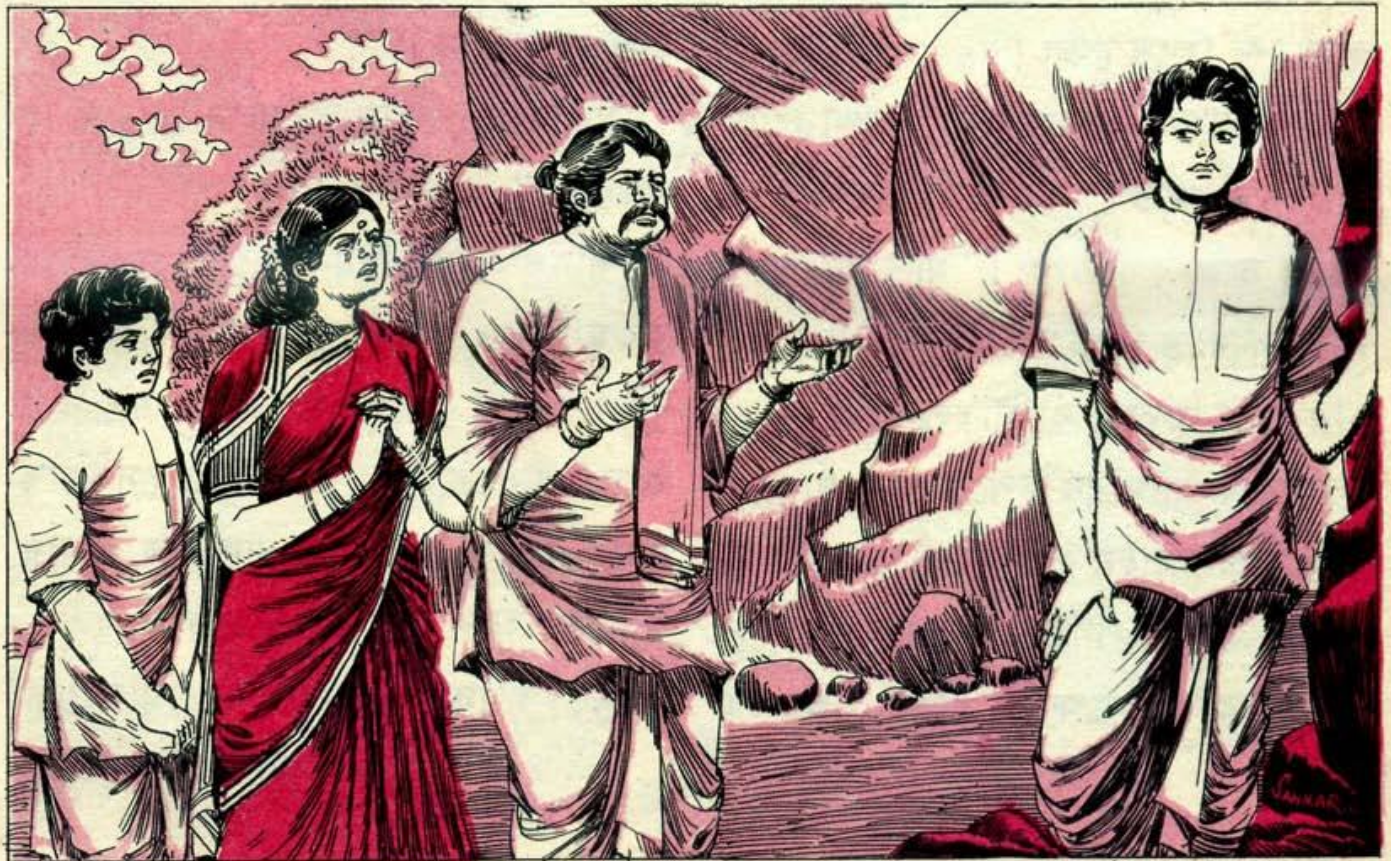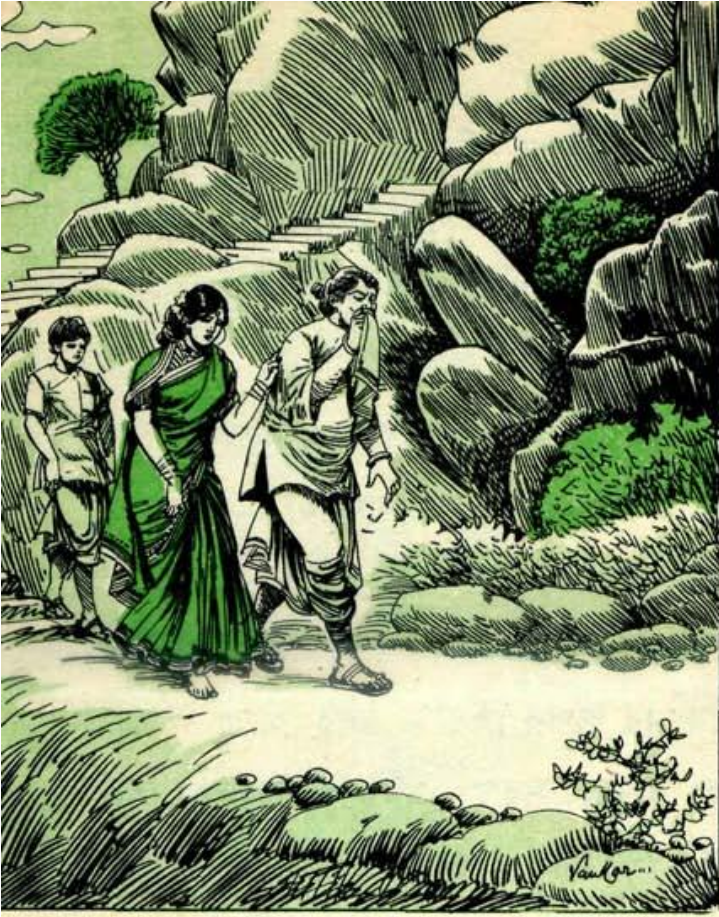
আপনারা ওর সঙ্গে দেখা করলে হয়ত ওর মনের পরিবর্তন হতে পারে।" বলে শ্রদ্ধানন্দ ফিরে গেল।

তৎক্ষণাৎ মদনমোহন সপরিবারে হরিকে দেখতে গেল। হরি প্রশান্ত মনে ওদের সঙ্গে কথা বলল। মা-বাবা, ছোট ভাই কাঁদতে কাঁদতে অনুরোধ করলেও হরি বাড়ি ফিরতে রাজী হল না।

হরিকে পাথরের উপরে শুয়ে থাকতে দেখে মদনমোহন তার জন্যে নরম একটি বিছানা গুহায় পাঠিয়ে দিল। শ্রদ্ধানন্দ যা খায় হরির পক্ষে তা খাওয়া সম্ভব নয় ভেবে মদনমোহন তার জন্য কিছু ভালো খাবারও চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল।

ঐ গুহায় একটা ধোপা আসত কাপড় জামা বিছানার চাদর ইত্যাদি নিয়ে যেতে। একদিন সে বলল, "হরিবাবুর কি যে সাধুগিরি বুঝি না। রোজ রোজ এত দূরে এসে পাহাড়ে উঠতে হয়। আমার যে কত কষ্ট হয় তা কেউ বোঝে না।" সে কথাটা হঠাৎ বললেও কথাগুলো হরির কানে ঢুকেছিল। তার কথা শুনে নরম বিছানার উপর তার বিরক্তি জাগল। ঐ বিছানাটা ধোপাকে দিয়ে হরি সাধুকে বলল, "প্রভু আমিও আপনার মত পাথরের উপর ঘুমিয়ে পড়ব। নরম বিছানা চাই না।"

"তাহলে তুমি বিছানাকে ত্যাগ করলে?" শ্রদ্ধানন্দ বলল।

আরও কিছুদিন পরে চাকরটার অবস্থা আর তার ব্যবহার দেখে হরি বুঝল রোজ রোজ তাকে যে এত কষ্ট করে আসতে হয় তার জন্য সে তার উপর বিরক্ত। সে ঐ চাকরকে খাবার আনতে বারণ করে শ্রদ্ধানন্দকে বলল, "প্রভু, আমি আর অত ভালো ভালো

খাবার খাবো না। আপনি যা খান আমিও তাই খাবো। আমি ঐ চাকরের মাধ্যমে বাবার কাছে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি।"

মদনমোহন রেগে গিয়ে হরিকে বলল, "দেখ, এই শেষবারের মত আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি; আজ যদি আমাদের সঙ্গে না আস তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না।"

এই ঘটনার কিছুদিন পরে অপ্সরার মত অতি সুন্দরী ষোড়শী সেই গুহায় এল।

"কে তুমি ?" হরি জিজ্ঞেস করল।

"আমাকে চিনতে পারছ না ?" সে বলল।

হরি তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলল, "তুমি কি নলিনী ?" মেয়েটাকে হরি চিনত। বছর পাঁচ-ছয় আগে ওদের পরিবারের সবাই রামনগর চলে গিয়েছিল। এই ছ বছরের মধ্যে মেয়েটির সঙ্গে হরির দেখাসাক্ষাৎ ছিল না।

"কালকেই তোমার খোঁজ করেছি।"

"আমি এখন সাধু। আমার এখন ঘর-বাড়ি, মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই।" হরি বলল।

"আমি যে তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসিনি।" নলিনী বলল।

"আমাকে ভালোবেসেছ ?" হরি বলল।

সেদিন রাত্রে হরির টানা ঘুম হল না। নলিনীর কথা সে ভাবছিল। তারও ইচ্ছা করল নলিনীকে দেখার। সে ভাবল, "কালকে নলিনী একবার এলে খুব ভালোই হবে।"

পরের দিন নলিনী এল। তাকে দেখে হরির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নলিনী এসেই হরিকে বলল, "আমার ভালো লাগছে না। আজকে আমি আর বাড়ি ফিরব না। আমিও এখানেই পড়ে থাকব। আমিও সাধু হয়ে যাব।"

হরি শ্রদ্ধানন্ধকে বলল, "প্রভু···"

"কি বল বাবা ? একেও ত্যাগ করার কথা জানাতে এসেছ ?" শ্রদ্ধানন্দ বলল।

"ত্যাগ করতে এসেছি প্রভু। তবে ওকে নয়, এই সাধুর জীবন।" সবিনয়ে হরি বলল।

এই কথা শুনে শ্রদ্ধানন্দ চমকে উঠে আস্তে আস্তে তার সমস্ত কথা শুনে বলল, "ঠিক আছে বাবা, সংসার জীবনে তুমি ফিরে যাও। কেউ তোমাকে আকর্ষণ করতে পারে নি বলেই জীবনের প্রতি তোমার বিরক্তি জেগেছিল। একটি মেয়ের ভালোবাসার ফলে তোমার মন থেকে সেই বিরক্তি যখন মুছে ফেলতে পেরেছ তখন তুমি নিশ্চিন্তে ফিরে যেতে পার। যাও তোমাকে যে ভালোবাসে তাকে তুমি ভালোবাসো।"

হরি শ্রদ্ধানন্দকে প্রণাম করে নলিনীকে নিয়ে বাড়ি ফিরল। তার এই পরিবর্তন দেখে বাড়ির সবাই খুশী হল। তারপর থেকে সে সকলের স্নেহ ভালো-বাসা পেল। এত লোকের স্নেহভালোবাসা পেয়ে হরি খুব খুশী হল। কয়েকদিনের মধ্যই নলিনীর সঙ্গে তার বিয়ে হল।

শহরের ব্যবসা

কোন এক দেশে চারুভূষণ নামে এক ছোটখাটো ব্যবসাদার ছিল। সে অল্প বয়স থেকেই ব্যবসা করেছিল। লোকের সঙ্গে সে হেসে কথা বলত। কম লাভ করত। ফলে সে লোকের ভালোবাসাও পেয়েছিল।

চারুভূষণের দুই ছেলে বড় হল। ওরাও বাপের দেখাদেখি ব্যবসা ধরল। চারু-ভূষণের বড় ছেলে অক্ষরে অক্ষরে বাবাকে অনুসরণ করত। সে বেশী লাভ করত না। কিন্তু দ্বিতীয় ছেলে কাশীপতি লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করার ধান্দায় ছিল। রাতারাতি প্রচুর রোজগার করে সে ছোট-খাটো একটা কুবের হওয়ার তালে ছিল।

কাশীপতির মনোভাব বুঝতে পেরে চারুভূষণ বলল, "দেখ বাবা, যারা পরের ভালোকে নিজের ভালো মনে করে তারা ঐ ধরণের ব্যবসা করতে পারে না। রাতারাতি বড়লোকও হতে পারে না। যারা লোককে দিনে দুপুরে ঠকাতে পারে, পুকুর চুরি করতে পারে একমাত্র তারাই রাতারাতি বড়লোক হতে পারে। আমরা যেভাবে চারজনের সঙ্গে মিলেমিশে ব্যবসা করছি সেইভাবেই করা উচিত।"

কিন্তু বাপের এই ধরণের কথা কাশী-পতির ভালো লাগল না। সে বলল, "দেখ বাবা, আমরা যেটা করছি, সেটাকে ঠিক ব্যবসা বলা চলে না। এভাবে আমি ব্যবসা করতে চাই না। আমি ভাবছি অন্য কোথাও গিয়ে ব্যবসা করব।"

কমল কানুনগো
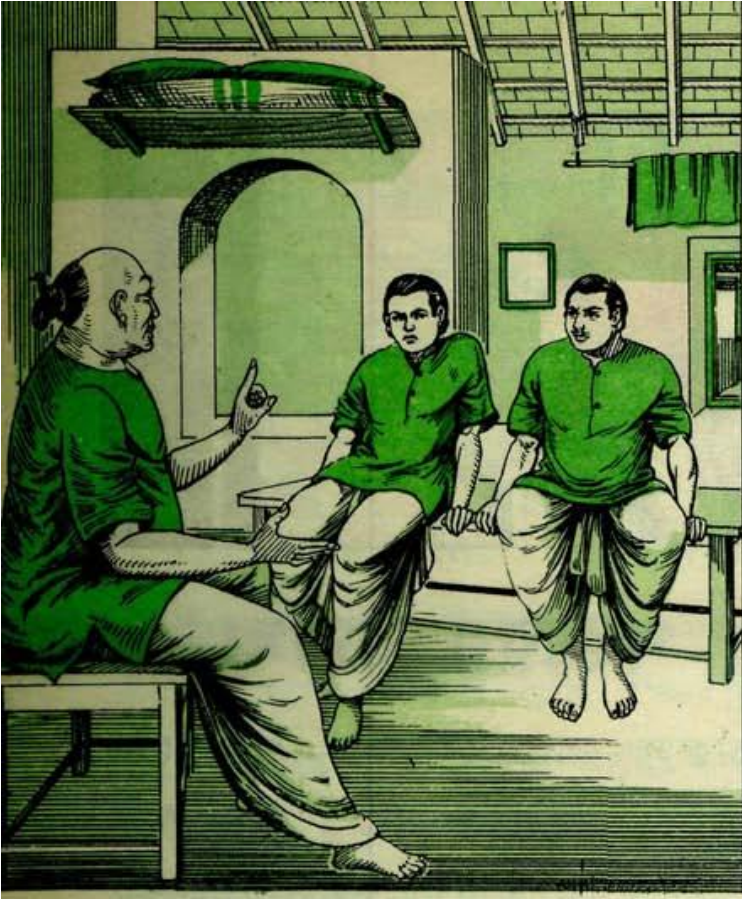
যে কথা সেই কাজ। সে সেই দিনই রওনা হয়ে চলে গেল। বাচ্চা বয়সে সে বাপের সঙ্গে শহরে যেত। সে শহরে এল। লক্ষ্য করল শহরে অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। বিরাট বিরাট পাকা বাড়ি উঠেছে। পথে ঘাটে মানুষের ভীড় বেড়ে গেছে। যেখানে সেখানে দোকান-পাট। বিভিন্ন জিনিসের অসংখ্য দোকান পথের আশে পাশে সেজে রয়েছে। শহরে ঐসব জমজমাট দোকান দেখে কাশীপতি ভাবল, আমি যা ভেবেছি ঠিক ভেবেছি। এই ধরণের একটা দোকান না করলে কি আর ইজ্জত থাকে। ব্যবসা করতে হলে চুটিয়ে ব্যবসা করতে হয়। বাবা যে ধরণের ভীরু, সেই ধরণের ভীরু লোকের ব্যবসার পথে আসা উচিত নয়।

কাশীপতি বাড়ি ফিরে এল। শহরে দোকান করার ইচ্ছা ঘোষণা করল। তার ভাগের টাকা দিয়ে দিতে বলল।

চারুভূষণ কি করা উচিত কিছুই ভেবে পেল না। তার বন্ধু তহশিলদারের কাছে গিয়ে পরামর্শ চাইল। সে কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "দেখ, তোমার ছেলের শহরে দোকান করার ঝোঁক যখন চেপেছে তখন তাকে তা করতে দাও। তুমি যত বারণ করবে তত তার শহরের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে। তাতে হয়ত তোমার কিছু টাকা গলে যাবে কিন্তু এছাড়া আমি অন্য কোন পথ খুঁজে পাচ্ছি না।"

"তাহলে তো ছেলেদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দিতে হয়!" মনমরা হয়ে চারুভূষণ বলল।

"এক্ষুণি ভাগ করতে হবে কেন? এখন 'দেখা যাক, করছি বলে' কদিন কাটিয়ে দিতে হবে।" বলে তহশিলদার আরও যা করতে হবে তা চারুভূষণকে

বলে দিল।

বাড়ি ফিরে এসে চারুভূষণ দুই ছেলেকে বলল, "দেখ, আমি ঠিক করেছি আমাদের বিষয় সম্পত্তি যা আছে সব ভাগ করে দেব। শহরে যে আমি বড় ধরণের ব্যবসা করতে চাইনা তা নয়, তবে আমাদের পরিবারে একটা গোপন ব্যাপার আছে তা তোমরা জানো না। এতদিন কাউকে বলিনি, তবে এখন সেটা তোমাদের জানা উচিত। সেটা হল বাজারে আমাদের অনেক ধার আছে। আগে হয়ত বলা উচিত ছিল কিন্তু বললে তোমরা কষ্ট পাবে তাই বলিনি। এই অবস্থায় যে মুহূর্তে লোকে জানতে পারবে যে সম্পত্তি ভাগ হয়ে যাচ্ছে সেই মুহূর্তে পাওনাদাররা এসে দরজার সামনে দাঁড়াবে। তাই ভাবছি, আগে আমাদের ধারটা মিটিয়ে যা থাকবে তা তোমাদের ভাগ করে দেব।"

তারপর দুই ছেলেকে নিয়ে চারুভূষণ তহশিলদারের কাছে গেল। ওদের বসিয়ে তহশিলদার একটা পুরোনো দলিল এনে ওদের সামনে ফেলে দিল। সেই দলিল দেখে কাশীপতির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে বিড় বিড় করে আপন মনে বলল, "এত ধার কি করে হল? এতকাল
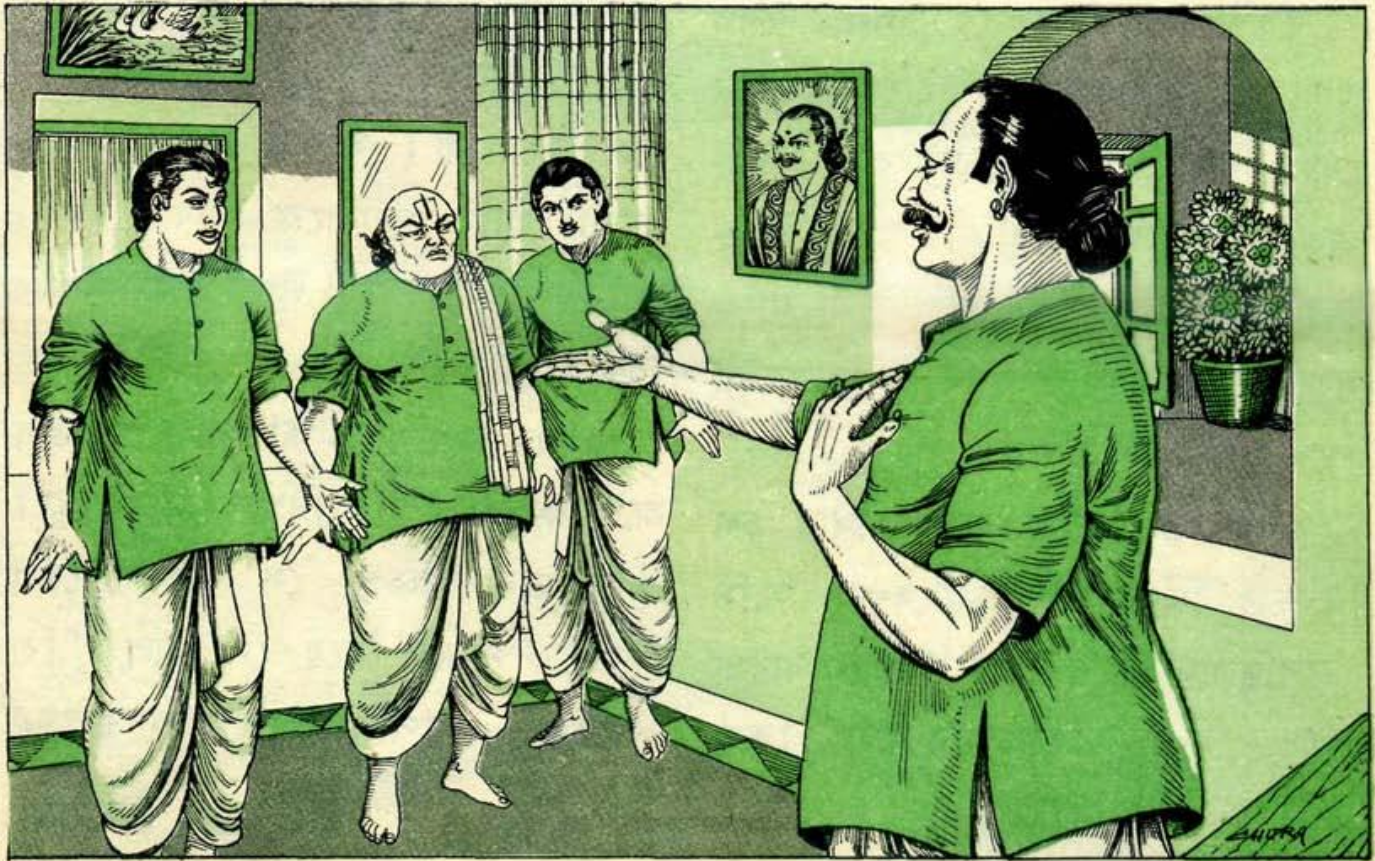
এই ধার মেটেনি কেন ?"

তহশীলদার শান্তভাবে বলল, "দেখ বাবা, তোমার বাবাকে চারজন সম্মান দেয়। আমিও তাকে সম্মান করি। তাই এতদিন অপেক্ষা করেছি। আমি ইচ্ছে করলে তোমাদের বিষয় সম্পত্তি যা আছে সব দখল করে নিতে পারি। তোমাদের পথে বসিয়ে দিতে পারি।"

কাশীপতি বিরক্ত হয়ে মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, "দেখুন, আমি ভেবেছিলাম শহরে গিয়ে বিরাট ব্যবসা ফেঁদে অনেক টাকা রেজগার করব। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমি এক হতভাগার পেটে জন্মেছি। আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে। আপনি আমাকে পথ দেখান। এভাবে, এত ধারের বোঝা মাথায় নিয়ে, বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না।"

"ঘাবড়ে যেও না বাবা। তোমার যদি সেই ক্ষমতা থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তোমার বাবার ভাগ্য ফেরাতে পারবে। তুমি উঠে পড়ে রোজগার করলে আমার ধার তুমি মিটিয়ে দিতে পারবে। তোমার ব্যবসার জন্য আমি বরং তোমাকে কিছু দিচ্ছি।" বলে ঐ তহশিলদার দু হাজার টাকা কাশীপতির হাতে দিয়ে বলল, "তোমার মনের মত ব্যবসা করতে গিয়ে এই দু হাজার টাকা জলে যায় যাক। ভেবে মরো না। আবার আমার কাছে এসো, আমি তোমাকে আবার দেব। জানিনা কেন তোমার উপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে।"

এইসব কথাগুলো কাশীপতি শুনছিল বটে কিন্তু তার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। তার মনে হচ্ছিল, সে ভুল শুনছে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, "কি বলছেন ? আপনি অত টাকা দেবেন

আর আমার হাত দিয়ে টাকা জলে যাবে?”

কাশীপতি টাকা নিয়ে শহরে চলে গেল। ঘুরে ঘুরে ভালো জায়গায় একটি ঘর ভাড়া নিল। সে মহাজনদের সঙ্গে আলোচনা করে হলুদ আর তেঁতুল দিয়ে ব্যবসা শুরু করল। কিছুদিনের মধ্যেই তার দোকানে ভীড় জমে গেল। তার কারণ সে দুপয়সা কমে বিক্রি করত।

তারপর কাশীপতি যত টাকা ছিল সব টাকা ঢেলে পেঁয়াজ কিনে ফেলল।

কিন্তু দেখা গেল পেঁয়াজের চাহিদা সে বছর বেশী ছিল না। কারণ পেঁয়াজের ফলন সে বছর অনেক বেশী ছিল।

কয়েকজন কুচক্রী ব্যবসাদার তাকে বলল, “দিন কয়েকের মধ্যে আমাদের পেঁয়াজ বিক্রি হয়ে যাবে। তখন তুমি যে দরে বিক্রি করবে লোকে সেই দরেই কিনতে বাধ্য হবে।”

ওদের কথা শুনে কাশীপতি পেঁয়াজের গোদামে তালা লাগিয়ে দিল। কিছুদিন পরে ওর গোদামের চারদিকের লোক চেঁচামেচি শুরু করে দিল। সবাই যেন কাকের মত ওকে ঠোকরাতে আরম্ভ করে দিল। নানা লোকের নানা কথা ঃ

“তুমি এক্ষুণি দোকান খালি কর।”

“গোদামও খালি কর।”
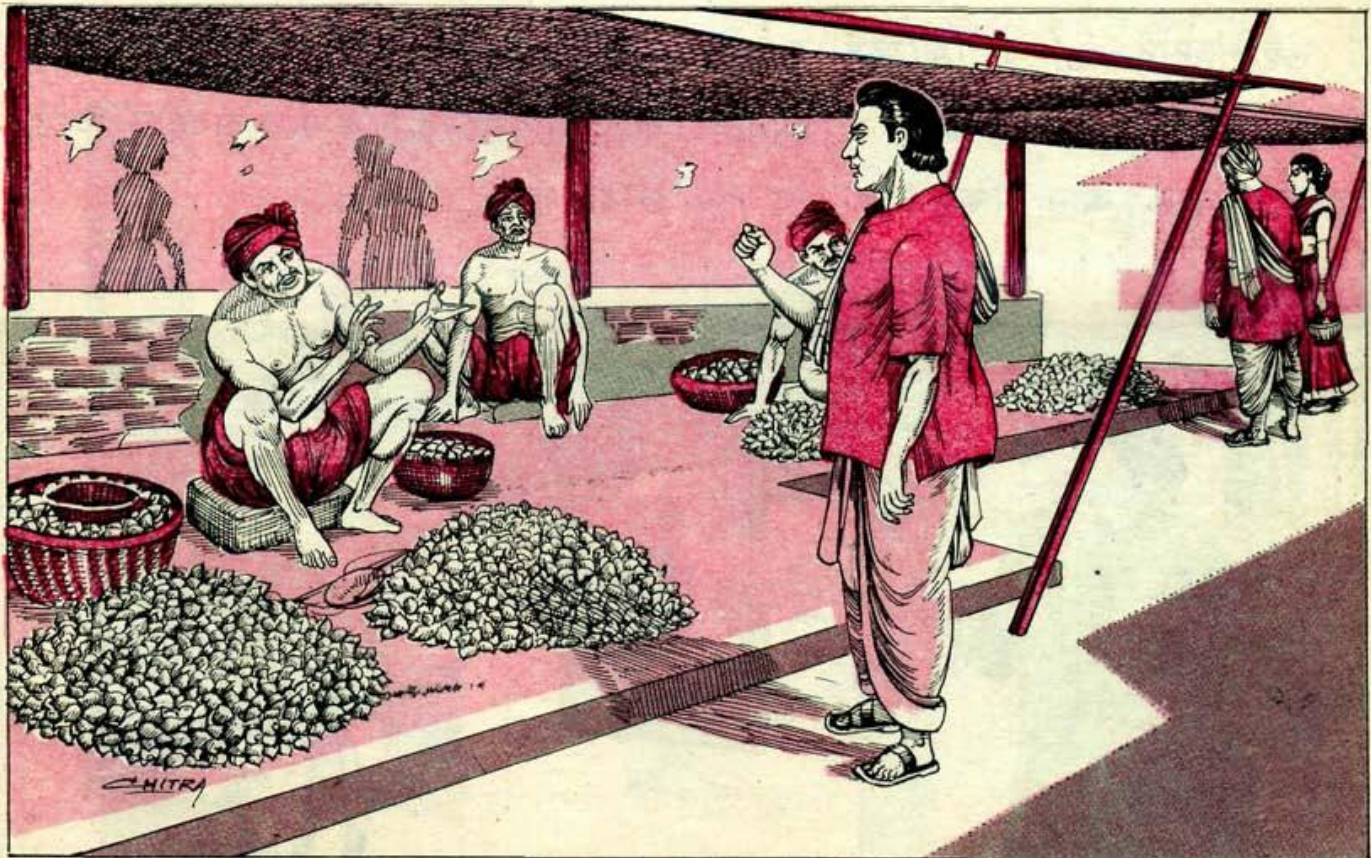
যা চেয়েছো সবই পেয়েছো তুমি আনন্দ...
তুমি ফাইভ-ষ্টার হোটেলের মালিক...

শহরের সবচেয়ে সম্মানিত আর ধনী লোক
তুমি...

তোমার ছেলেমেয়েরা পড়ছে সবচেয়ে ভালো স্কুলে...

তোমার আদুরে মেয়ের বিয়ে হবে
শহরের মস্তো ধনী পরিবারে...

কিন্তু...চোখে জল কেন তোমার...আনন্দ?
এই তো চেয়েছিলে তুমি...তাই না?
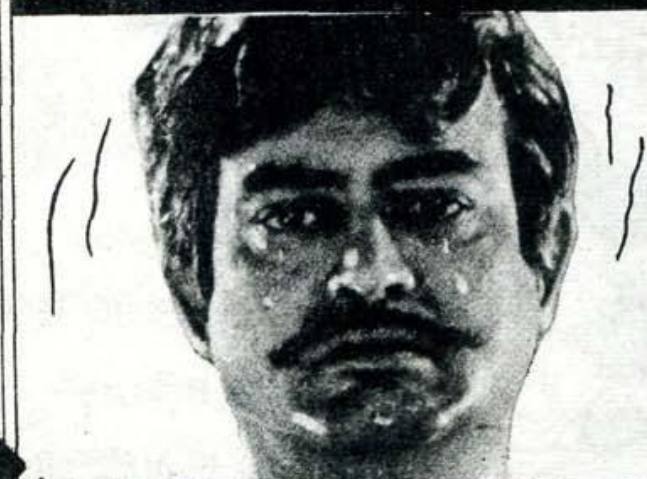
বি নাগি রেড্ডীর ছবি

—যেখানে
ক্যামেরা রয়েছে
মানুষের মনের কাছাকাছি—

এ্যাহি হ্যায় জিন্দগী

ফিল্মসেন্টার কৃত
ইষ্টম্যানকালার

মানুষের মনের গভীরের ছবি—
তার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বন্দ্ব

পরিচালনা ঃ কে এস্ সেতুমাধবন সংলাপ ঃ ইন্দ্ররাজ আনন্দ
গীতরচনা ঃ আনন্দ বক্সী সঙ্গীত ঃ রাজেশ রোশন

বিজয়া প্রোডাকশন্স কৃত
ফিল্ম

"পচা গন্ধ বেরোচ্ছে।"

"দুর্গন্ধের চোটে টিকতে পারছি না।" বিক্রি করা তো দূরের কথা ওসব যে কোথায় ফেলবে সে জায়গাও সহজে খুঁজে পেল না সে।

আবার লোকে কথা শোনাল, আরে মশাই, পেঁয়াজে হাওয়া না লাগলে যে নষ্ট হয়ে যায় তাও জানেন না? এটুকু না জেনে পেঁয়াজের ব্যবসা করছেন?"

তখন কাশীপতি বুঝতে পারল অন্য পাইকারীরা তাকে কিভাবে বোকা বানিয়েছে। আরও বুঝল যে, শহরের ব্যবসাদারের পেটে এক কথা থাকে মুখে অন্য কথা থাকে।

তহশিলদার তাকে জিজ্ঞেস করল, "কি কাশীপতি তোমাকে মনমরা দেখাচ্ছে কেন? আরও কিছু টাকা দেব?"

"না আর চাইনা। এখন আপনার যে টাকা নিয়েছি তা শোধ দিতে পারলে বাঁচি।" তারপর যা ঘটেছিল সবিস্তারে কাশীপতি তাকে জানাল।

"এখন তাহলে সত্য ঘটনাটা বলি। তুমি যাতে ঠেকে শেখ তার জন্যই আমি আর তোমার বাবা পরামর্শ করে তোমার হাতে দু হাজার টাকা দিয়েছিলাম। তোমাকে যে টাকা দিয়েছি সেটা আমার নয়, তোমার বাবার। অতএব, ধারের কোন প্রশ্ন নেই।" তহশিলদার বলল।

কাশীপতির মনে হল তার মাথার উপর থেকে যেন একটা পাহাড়ের বোঝা নেমে গেল। তারপর থেকে সে বাপের মত অল্প লাভ রেখে ছোটখাটো ব্যবসা করে, চারজনের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে, জীবন কাটিয়ে দিল।
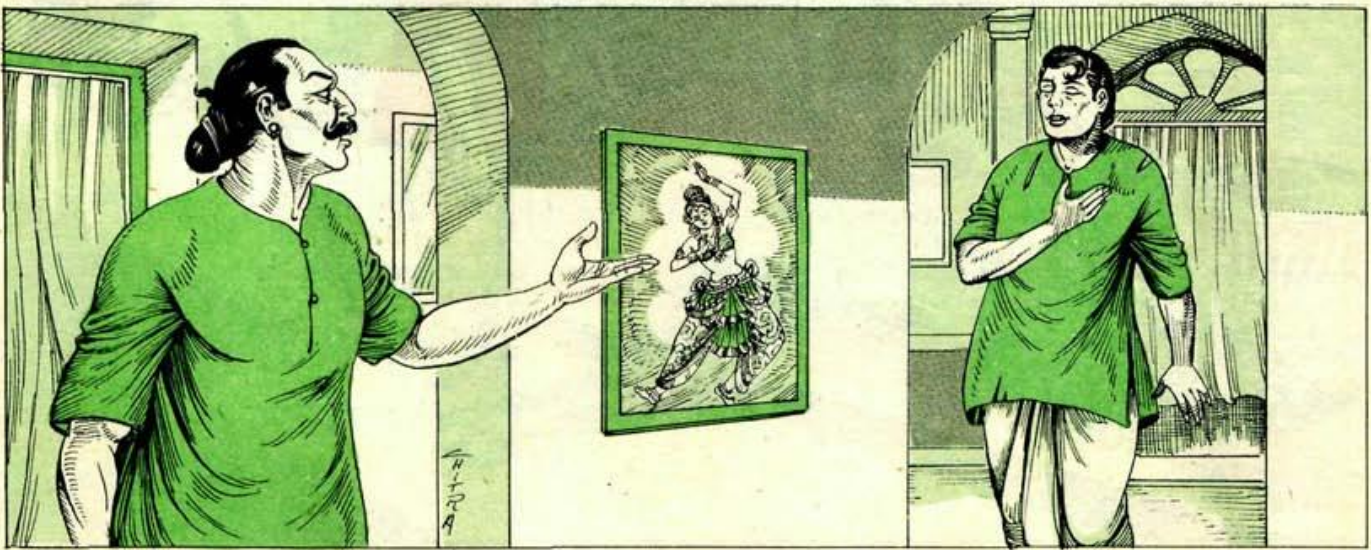
ব্যবসায়ে সাহায্য

কোন এক শহরে একটা ফলের দোকান ছিল। গ্রীষ্মকালে ঐ ফলের দোকানদার আম বিক্রী করতে লাগল।

একদিন একটা লোক ঐ দোকানদারকে বলল, "আমাকে কাজ দিন।"

দোকানদার জবাব দিল, ''কাজ নেই।"

''কাজ না থাক, আপনার দোকানে যে ছোট ছোট আমগুলো রয়েছে সেই আমগুলো আমি কাছে-পিঠে বসে বিক্রি করে দেব। তারপর সেই পয়সা হাতে পেয়ে- আপনি আমাকে যা দেবেন তাই নেব।" দোকানদার তাকে কিছু ছোট ছোট আম দিল। লোকটা ঐ আম নিয়ে অদূরেই বিক্রি করতে বসল।

সেদিন ঐ দোকানদারের অনেক আম বিক্রি হল। এত বিক্রি কোনদিন তার হয় নি। দিনের শেষে লোকটা ঐ ছোট আমগুলো এনে দোকানদারকে ফেরত দিয়ে কিছু পারিশ্রমিক চাইল।

"তুমি তো একটাও বিক্রি করতে পারনি, কি দেব ?" দোকানদার জিজ্ঞেস করল।

"আমি যে বিক্রি করতে পারি নি এটা ঠিক। কিন্তু আমি এই ছোট আম নিয়ে, অদূরে বসে, বেশী দাম না হাঁকলে খদ্দেররা আপনার কাছে আসত না। এত বেশী বিক্রি হত না।" দোকানদার ভেবে লোকটার হাতে কিছু পয়সা দিল।
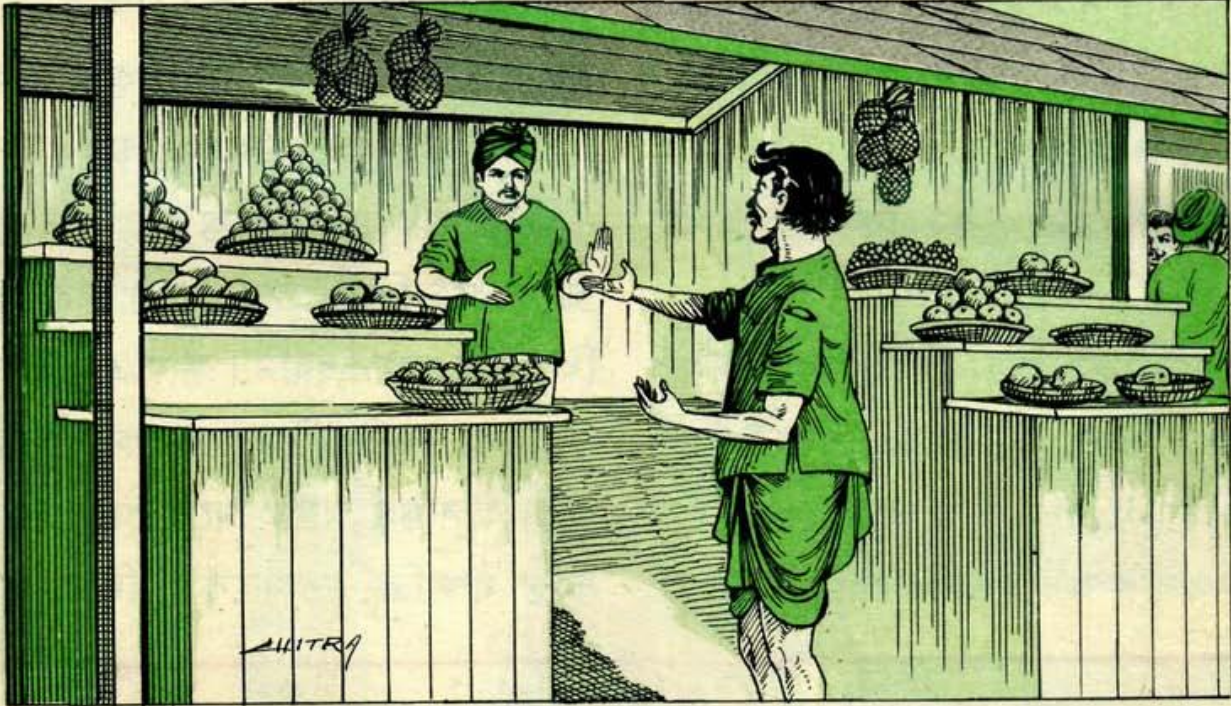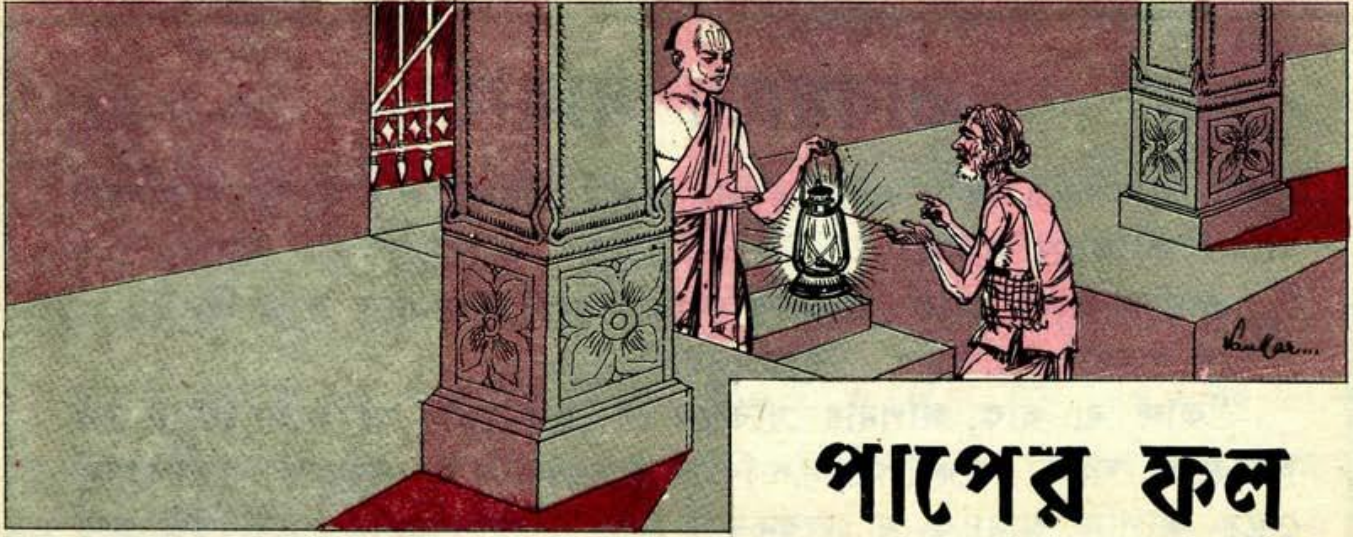
পাপের ফল

এক জায়গায় শিবঠাকুরের মন্দির ছিল। চারদিকের লোক ঐ মন্দিরে এসে পূজো দিত।

একদিন রাত্রে পুরুতঠাকুর মন্দিরের দরজা বন্ধ করে হাতে আলো নিয়ে মন্দিরের বাইরে পা রাখতেই, একটা রোগা লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "বাবা, একবার মন্দিরের দরজাটা খুলবেন? ঠাকুরের দর্শন করতে এসেছি।" সে এমনভাবে বলল যেন পুরুতঠাকুরকে প্রার্থনা করছে।

পুরুতঠাকুর তার দিকে আপাদমস্তক তাকিয়ে বলল, "ঠাকুরের শয্যা দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আর দরজা খোলা হবে না। আবার কাল ভোরে দরজা খুলব।"

"সারা রাত আমাকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে?" লোকটা উদ্বিগ্ন হয়ে এমনভাবে বলল যেন নিজেকেই বলছে।

"এই বারান্দায় ঘুমোতে পারেন।" বলে পুরুতঠাকুর চলে গেল।

লোকটা হাতড়ে হাতড়ে বারান্দার এককোণে গুছিয়ে বসল। সেই অন্ধকারে কি আর করবে, একথা সেকথা ভাবতে লাগল। তার অতীত মনে পড়ল।

তার নাম চপলাকান্ত। সে সংসারে আছে বটে কিন্তু তার সাংসারিক জ্ঞান, বিষয়বুদ্ধি তেমন হয়নি। তার একটা বুড়ো বন্ধু ছিল। বন্ধুটির তিনকুলে কেউ ছিলনা। বুড়ো বলেছিল আমি মরে গেলে আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমাকেই দিয়ে যাব।

অনুরাধা দেবী

তবে বুড়ো কোনদিন চপলকান্তকে বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দিত না। চপলাকান্ত আর তার বউ বুড়ো যে কবে মরবে তার অপেক্ষায় ভাগাড়ের শকুনের মত দিন গুণত।

একদিন খবর পেল বুড়ো মারা গেছে। শুনেই চপলাকান্ত আর তার বউ ছুটে গেল তার বাড়ি। কাজ কর্ম করল।

তারপর চপলাকান্ত আর তার বউ সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু কানাকড়িও খুঁজে পেলনা। পূজোর ঘরে শিবঠাকুরের একটি সুন্দর বিগ্রহ ছিল। বিগ্রহটি দক্ষিণ ভারতের। ওটি ছাড়া সারা ঘরে আর কিছু ছিল না। চপলাকান্ত ভেবে পেল না বুড়ো তার সারা জীবনের রোজগার কি করেছে।

"এই তামার শিবের বিগ্রহ দিয়ে কি হবে? এটা কি ডিম পাড়বে?" বলে চপলাকান্ত শিবের ঐ বিগ্রহটি ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল।

"দেখ, ঘটে বুদ্ধি থাকলে যে কোন জিনিসকে কাজে লাগিয়ে অনেক রোজগার করা যায়।" বলল চপলাকান্তের বউ হৈমন্তী।

তারপর কানে কানে হৈমন্তী স্বামীকে কি যেন বলল। তার কথা শুনে

চপলাকান্ত তাকে প্রশংসা করল। একটি কাপড়ে বিগ্রহটি জড়িয়ে নিয়ে গোপনে সেটাকে নিয়ে সে বাড়ি ফিরল।

পরের দিন সকালে চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল, "চপলাকান্তের বাড়ির পেছনে মাটি খুঁড়ে শিবঠাকুরের বিগ্রহ পাওয়া গেছে। রাত্রে হৈমন্তী দেবী স্বপ্ন দেখেছিল। সেই স্বপ্ন অনুসারে পেছনের দিকে মাটি খুঁড়ে শিবের বিগ্রহ পাওয়া গেল।" খবর পেয়েই লোকে ঐ শিবের বিগ্রহ দেখার জন্য দলে দলে আসতে লাগল। অনেকে ঐ বিগ্রহের সামনে পয়সা ফেলতে লাগল।

ওরা এসে দেখল হৈমন্তী চোখ বুজে মাথার চুল ফেলে মূর্তির কাছে বসে আছে। তার সামনে বসে লোকে যে প্রশ্ন করছে সে তার জবাব দিচ্ছে। সবাই তার জবাব শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছে। হৈমন্তী এমনভাবে জবাব দিচ্ছিল যেন সে স্বয়ং শিবের মুখের কথা জেনে সে বলে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে সে মূর্ছা যাওয়ার মত কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে আবার উঠে বসছিল। এইসব দেখেশুনে যারা এসেছিল তারা অবাক হয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে বাড়ি ফিরে গেল।

সকলের চলে যাওয়ার পরে সে, পয়সাকড়ি হিসেব করে দেখল অনেক পয়সা হয়েছে।

সে দক্ষিণ ভারতের মূর্তিটিকে একটি ঘরের মাঝখানে রাখল। প্রত্যেক সোম-বার হৈমন্তীদেবীর উপর ঠাকুর ভর করত। ঐ সময় যে যা প্রশ্ন করত ঠাকুর যেন হৈমন্তীর মাধ্যমে সে সব প্রশ্নের জবাব দিত। ফলে প্রত্যেক সোমবার অসংখ্য মানুষের ভীড় হত।

কিছুদিন এইভাবে চলার পর খুচরো

পয়সা যে দক্ষিণা পড়ত তাতে চপলাকান্তের মন ভরল না। সে ভাবল, এখানে বিরাট একটা মন্দির তুলতে হবে।

পরেরদিন চপলাকান্ত একটা বড় তামার কলসী এনে হলুদ কাপড় দিয়ে সেটাকে বেঁধে বিগ্রহের পাশে রাখল। তার পরের সোমবার হৈমন্তী ভক্তদের বলল, "তোমাদের মধ্যে যদি কেউ তেমন পূণ্যাত্মা থাকো তাহলে আমার জন্য একটি মন্দির তোল।"

তারপর থেকে কলসীতে বেশী বেশী করে পয়সা পড়তে লাগল। ঐ কলসী কয়েক মাসের মধ্যেই ভরে গেল।

হৈমন্তী তার স্বামীকে বলল, "ঠিক এই ধরণের এই মাপের একটা কলসী বানিয়ে নিলেই তো হয়। সেই কলসীটাকে হলুদ কাপড়ে জড়িয়ে বিগ্রহের পাশে রেখে দিলেই হবে। কেউ টের পাবে না আসল কলসীটা সরানো হয়েছে। এই নতুন কলসীতে আমরা খোলামকুচি ঢেলে ভর্তি করে মাঝ রাত্রে তামার কলসী নিয়ে পালাব।"

চপলাকান্ত দরজার কোণে যে কলসীটা ছিল সেই কলসীটা মাথায় তুলে নিয়ে অন্ধকারে হাঁটতে লাগল।

সকাল হওয়ার আগেই ওরা অনেক-

দূর পৌঁছে গিয়েছিল। ততক্ষণে ওরা নিজের গ্রামকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছিল। হাঁটতে হাঁটতে দুপুরে একটা নির্জন জায়গায় ওরা বিশ্রাম করল। সেই সময় চপলাকন্তের মনে হল কলসী থেকে কিছু পয়সা বের করা ভালো। সে কলসীটা খুলে দেখে উপরে একমুঠো পয়সা আছে। এ ছাড়া কলসী ভর্তি খোলামকুচি।

আসল ঘটনা ঘটেছিল অন্যরকম। ঘুম থেকে উঠে হৈমন্তী কলসী বদল হয়েছে কিনা দেখার জন্য বিগ্রহের পাশে যে কলসীটা ছিল সেটা দেখল। উপরেই পয়সা ছিল। ঐ পয়সাগুলো তার কিছুক্ষণ আগে চপলাকান্ত ঢেলেছিল। তাই হৈমন্তী ভাবল, স্বামী কলসী বদল করে নি। সেটাই আসল কলসী। সে তাড়াতাড়ি ঐ কলসীটাকে তুলে দরজার কোণে রেখে, দরজার কোণে যেটা ছিল সেটা বিগ্রহের কাছে রেখে দিল।

পরে সব বুঝতে পারল স্বামী স্ত্রীতে। জেনে হৈমন্তীর কোমর যেন ভেঙ্গে গেল। সে শয্যাশায়ী হল। সেই যে শয্যায় পড়ল আর উঠল না। মরে গেল। চপলাকান্ত মরে নি। তবে তার শরীর শরীর মন ভেঙ্গে গেল। ওরা যে কলসীটা শিবঠাকুরের কাছে রেখে এসেছিল তার টাকা দিয়ে ভক্তেরা মন্দির করেছিল। অনেক বছর পরে চপলাকান্তের ইচ্ছে জাগল ঐ শিবঠাকুরের অবস্থা একবার নিজের চোখে দেখার। সে কষ্ট করে হেঁটে নিজের গ্রামে ঐ মন্দিরের সামনে যখন এল তখন সে অবাক হল। কিন্তু শিবঠাকুরের দর্শন সে রাত্রে হল না।
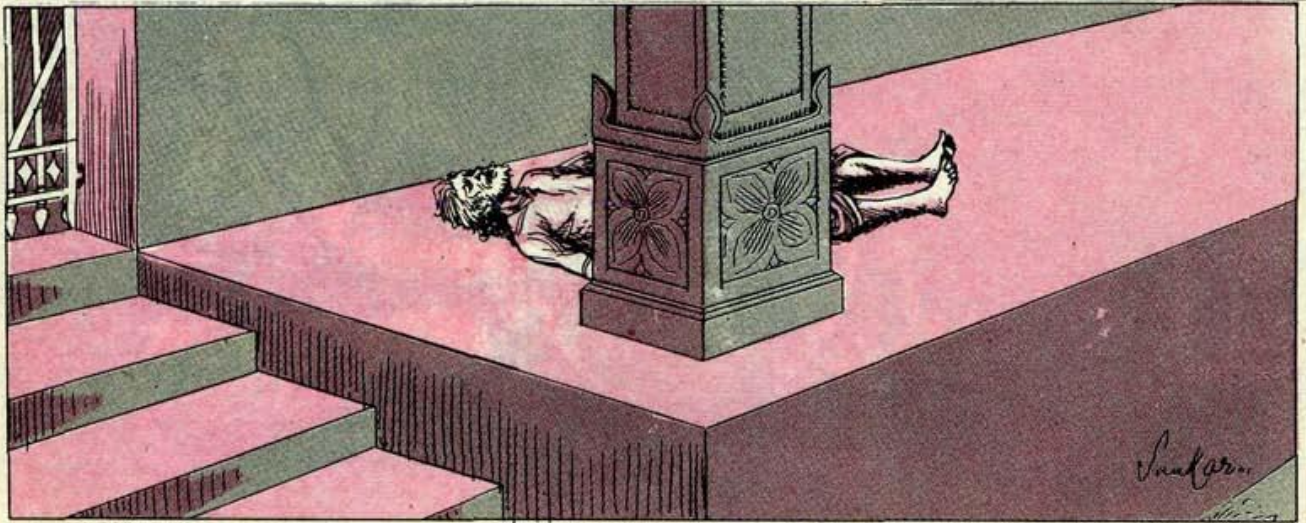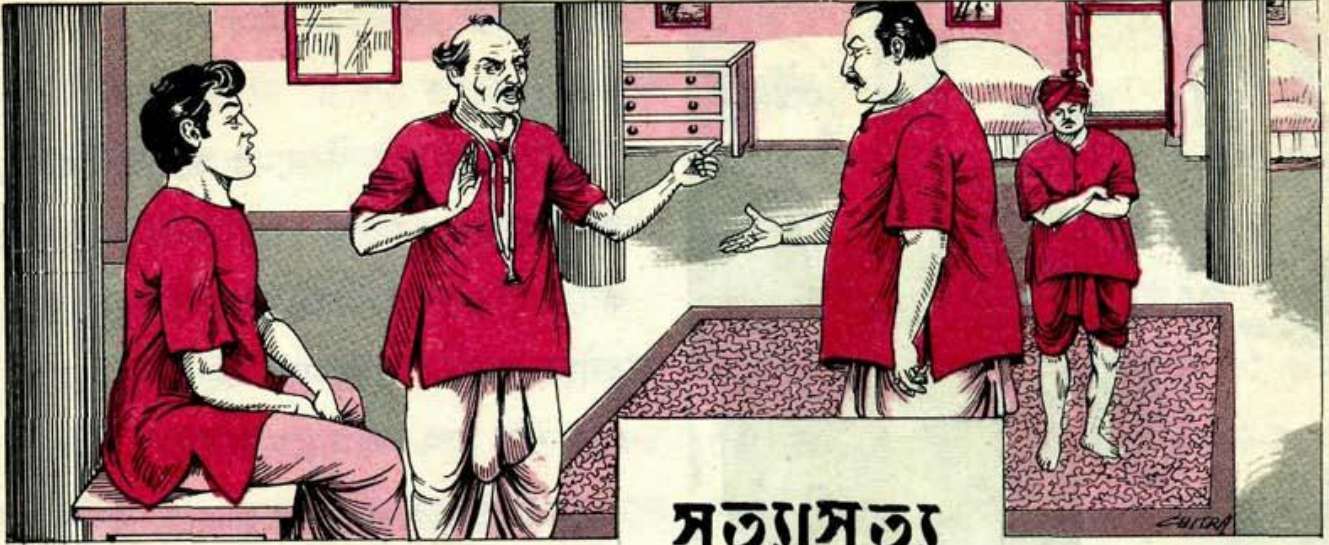
সত্যাসত্য

এক ছিল জমিদার। নাম ভূষণ। তার ছেলের নাম বীরু। তার অভ্যেস ছিল রাত্রে অশ্বত্থ গাছের নীচে ঘুমোনো। সকালে তার ঘুম ভাঙ্গতো পাখির কলরবে। পাখির ডাক শুনে উঠতে তার ভালো লাগতো।

একদিন সকালে বীরু ঘুম ভাঙ্গার পর উপরের দিকে তাকিয়ে আর্তনাদ করে মূর্ছা গেল। তার আর্তনাদ শুনে ভূষণ ছুটে এসে দেখে ছেলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। চাকরদের সাহায্যে সে ধরাধরি করে বীরুকে ঘরে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে বীরুর জ্ঞান ফিরে এল। কিন্তু তার চাউনিতে অস্বাভাবিক ভাব ছিল। কথাগুলো এলোমেলো ছিল। তার অবস্থা দেখে ভূষণ ঘাবড়ে গেল। বিশেষ করে সেদিন পাত্রীপক্ষের লোক ভূষণকে দেখতে আসার কথা ছিল। ভূষণ তৎক্ষণাৎ ওদের বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিল—এক সপ্তাহ পরে আসতে। তারপর পাশের বাড়ির বদ্যি সদানন্দকে ডেকে পাঠাল।

সদানন্দ এসে বীরুকে পরীক্ষা করে বলল, "অসুখ-বিসুখ কিছু হয়নি। ওর মাথায় ভূত চেপেছে। হয় চেপেছে না হয় ভূত দেখে সে ভয় পেয়েছে। আমাদের এখানকার মঠের সাধুকে ডেকে আনি, চলুন।"

দুজনে সাধুর কাছে গেল। গিয়ে দেখল, একটা লোক, তার মাথায় নাকি

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

ভূত চেপেছে, সাধুর চারদিকে ভনভন করে ঘুরছিল। সাধু তার মাথায় হাতের ছড়ি দিয়ে তিনবার মারল। সঙ্গে সঙ্গে ভূত নেমে গেল। তারপর ভূষণ সাধুর কাছে গিয়ে ছেলের কথা বলল।

সাধু চোখ বুজে কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলে বলল, "তোমার ছেলের মাথায় ভূত চাপে। তোমার কোন শত্রু অন্যভাবে তোমার ছেলের ক্ষতি করছে। সেটা নিশ্চয়ই কোন তান্ত্রিকের কাজ। তোমা-দের এখানে কতজন তান্ত্রিক আছে?"

"দুজন আছে প্রভু। একজনের নাম শরভ আর একজনের নাম শাম্ভ।" বলল ভূষণ।

"নিশ্চয়ই এই দুজনের মধ্যে একজন এই অপকর্ম করেছে। তুমি এক্ষুনি ওদের কাছে যাও। তোমার ছেলেকে সারিয়ে তুলতে বল। দুজনের মধ্যে যে রাজী হবে তার নাম আমাকে জানিয়ে যাও।"

ভূষণ ও সদানন্দ ফিরে এসে ঐ দুজন তান্ত্রিকের কাছে গেল। ওদের ডেকে আনল। শরভ বীরুকে দেখে পরিষ্কার বলে দিল, "একে আমি সারিয়ে তুলতে পারব না।" তার চলে যাওয়ার পর শাম্ভ বীরুকে পরীক্ষা করে দেখে বলল, "একে আমি সারিয়ে তুলতে পারি। এই অপকর্ম যে কে করেছে আজ রাত্রেই আমি অঞ্জন লাগিয়ে জিজ্ঞেস করব। ঐ শরভ পয়সাকড়ির জন্যে করেনা এমন কাজ নেই। আমার ধারণা এটা ওরই কাজ। সেইজন্যেই সে পারবে না বলে কেটে পড়েছে। আজ রাত্রেই ওর দফারফা হয়ে যাবে।"

ঐ দুজন তান্ত্রিকের মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকত। শাম্ভকে বিদায় দিয়ে ভূষণ সাধুর কাছে ছুটে গেল। তাকে

বলল সে, "সান্তু চিকিৎসা করতে রাজী হয়েছে। আমার ছেলের অপকার যে কে করেছে তাও নাকি আজ রাত্রে সে জানিয়ে দেবে। ও জোর দিয়ে বলল, এটা নাকি শরভেরই কাজ।"

সাধু আড়চোখে ভূষণের দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখছি, তুমিও শরভকেই সন্দেহ করছ। কিন্তু আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এই অপকর্ম ঐ সান্তুই করেছে।"

ভূষণ কি করতে হবে তা সাধুর কাছে জেনে নিল। সেদিন রাত্রে ভূষণ, প্রতি-বেশী সদানন্দ এবং আরও দুজন সান্তুর বাড়ির উপর নজর রাখল।

মাঝরাত্রে সান্তু ঘরের মাঝখানে আল্পনা দিল। তার মাঝখানে একটি মরা সাপ রাখল। সাপের উপর রেখে দিল একটি খুলি। খুলির উপরে রাখল নেবু। ধুনো দিল সে। শেষে ঐ আল্পনার সামনে সান্তু বসতে যাবে এমন সময় আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঐ চারজন ঘরে ঢুকে সান্তুকে বেঁধে মেরে তাকে সাধুর কাছে নিয়ে গেল।

ওরা মারতে মারতে সাধুকে দোষ স্বীকার করতে বলল। কিন্তু সে সাধুকে বলল, "প্রভু, ভগবানের নামে শপথ করে বলছি আমি কোন দোষ করিনি।"

চাঁদমামা

সংস্থাপক : চক্রপাণি

নিয়ন্ত্রণ : বি. নাগি রেড্ডি

দু ভাবে দেশের উন্নতি করা যায়। অন্যের কাছ থেকে নেয়া জিনিস দিয়ে, আর এক ভাবে করা যায় নিজেদের পরিশ্রম কাজে লাগিয়ে। ধনবর্মা এবং ধীরবর্মা—দুজনেই সাধুর কাছ থেকে কৌটো নিল। নিয়ে কে কি করল তা জানতে হলে পড়তে হবে এবারের বেতাল কাহিনী।

ব্যবসা সবাই পারে না। আগে জানতে হয়, কত ধানে কত চাল হয়। না জেনে ব্যবসা করতে গেলে কি হয় তা 'শহরে ব্যবসা' কাহিনীতে পরিবেশিত হয়েছে। এ ছাড়া, 'পাপের ফল', 'সত্যাসত্য' প্রভৃতি মজার মজার কাহিনী আছে।

খণ্ড ৫ জানুয়ারী ১৯৭৭ সংখ্যা ৭

প্রতি সংখ্যা ১.২৫ বাৎসরিক চাঁদা ১৫.০০

ভূষণের লোক সাধুকে মারতে যাবে এমন সময় "থামুন!" বলে শরভ গর্জে উঠল। সে কোত্থেকে সেখানে এসে জোরে জোরে বলল, "আসল অপরাধী সান্তু নয়। এই সাধুর বেশধারী লোকটা।"

এই হৈ-চৈ এর মধ্যে সুযোগ বুঝে ঐ সাধু পালানোর তাল করছিল। কিন্তু সবাই তাকে ধরে মারতে লাগল। তখন সে হাউমাউ করে কেঁদে বলল, "শুনুন, শুনুন, আমি যে অপরাধ করেছি তার জন্য আমি একা দায়ী নই। এই জঘন্য অপরাধ আমাকে দিয়ে করিয়েছে অপনাদেরই একজন বিশ্বাসী লোক।" বলে সে সদানন্দকে দেখিয়ে দিল।

তৎক্ষণাৎ সদানন্দের বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল। তার মুখ কালো হয়ে গেল।

ভূষণ সদানন্দের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "এই জঘন্য কাজ তুমি করলে?" বাপের এই প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারল না। বীরু সেখানে হাজির হয়ে বলল, "সবাই জানে, সদানন্দ খুব কিপ্‌টে লোক। তার একটি মাত্র মেয়ে। তার ইচ্ছে ছিল আমার সঙ্গে ঐ মেয়ের বিয়ে দেওয়া। বিনা খরচায় বিয়েটা করানোর জন্য সে এই সাধুর সাহায্য নিল। আমি পাগল হয়ে গেলে আমাকে কোন মেয়েপক্ষ পছন্দ করবে না। তখন সদানন্দ তার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কাজটা শেষ করে ফেলবে। সবাই যখন সান্তুকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল তখন এই শরভ আমাকে সারিয়ে তুলেছে। এখন আমার আর কোন ভয় নেই।"

সদানন্দ অপরাধীর মত মাথা নীচু করে রইল। পরে অবশ্য সদানন্দের মেয়ের সঙ্গেই বীরুর বিয়ে হল এবং সেই বিয়েতে সদানন্দকে প্রচুর অর্থ খরচ করতে হল।
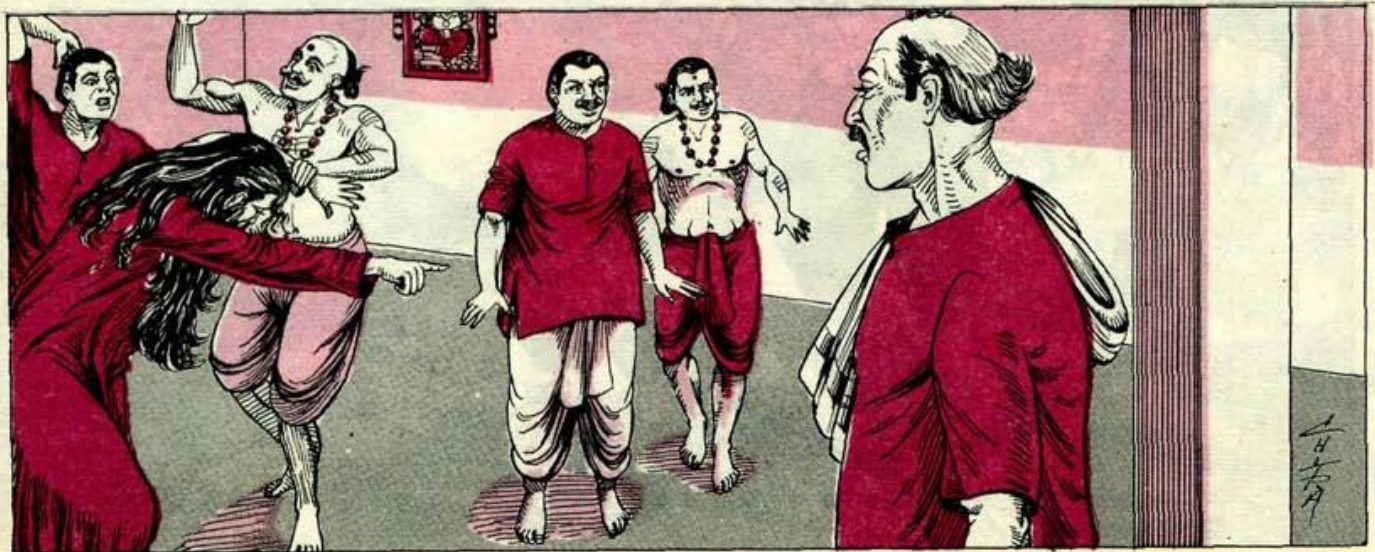
কুম্ভকর্ণ আর বসে থাকতে পারল না। মহোদরের কথা শুনে সেরাক্ষসগণসহ রাবণের কাছে গেল। রাক্ষসেরা আগে থেকেই রাবণের কাছে গিয়ে বলল, "কুম্ভকর্ণের ঘুম ভেঙ্গে গেছে। ওকে কোন্ নির্দেশ দেবেন? ওকি সোজা যুদ্ধে চলে যাবে, না কি এখানে আসবে?"

"আগে কুম্ভকর্ণের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তাকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এস।" রাবণ বলল।

রাক্ষসেরা সেই কথা কুম্ভকর্ণকে বলার সঙ্গে সঙ্গে সে আর দেরি না করে সোজা রাবণের কাছে গেল।

দূর থেকে বানররা কুম্ভকর্ণকে দেখে ভীষণ ভয় পেল। অত বড় চেহারার কোন রাক্ষসকে ওরা তার আগে দেখেনি। ওকে দেখে যে যেদিকে পারল পালাতে লাগল। দূর থেকে রামও কুম্ভকর্ণকে দেখলেন। বানরদের ছোটাছুটিও রামের নজরে পড়ল। রাম বিভীষণকে জিজ্ঞেস করলেন, "বিরাট মেঘের মত যাকে এদিকে আসতে দেখা যাচ্ছে কে সে?"

বিভীষণ রামকে বলল, "সে হল বিশ্রবসের ছেলে, নাম কুম্ভকর্ণ। যুদ্ধে যম আর ইন্দ্রকে সে পরাজিত করেছে। এর দেহ যত বড় তত বড় দেহ কোন রাক্ষসের
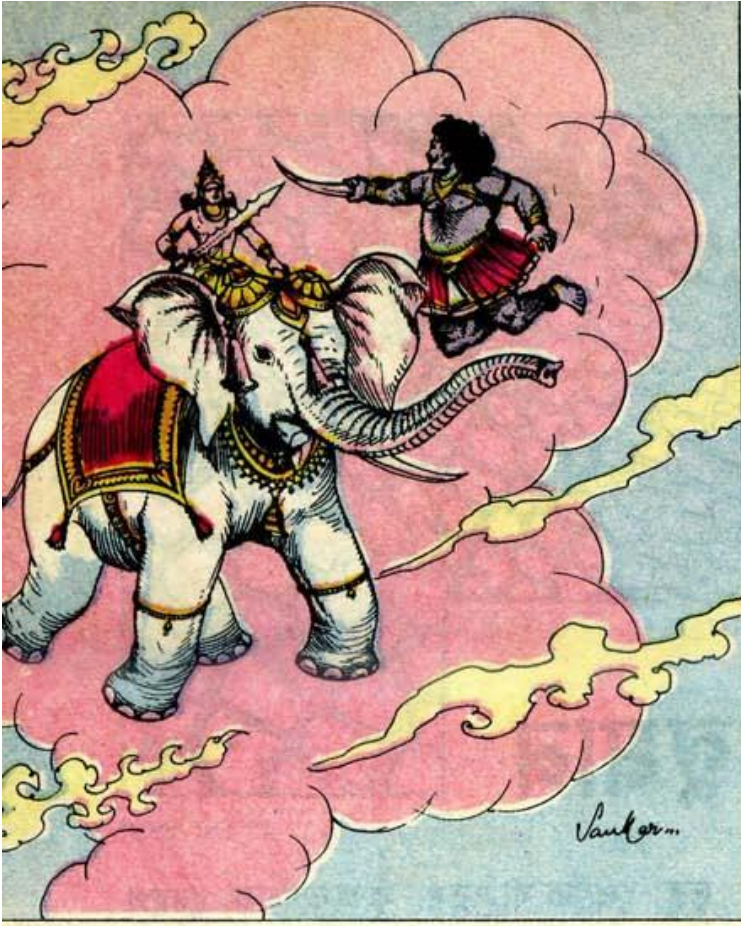
নেই। অন্যান্য রাক্ষস নানা ধরণের বর লাভ করে শক্তিশালী হয়েছে। কিন্তু কুম্ভকর্ণ জন্ম থেকেই শক্তিশালী। জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুম্ভকর্ণ হাজার হাজার প্রাণী খেয়ে ফেলেছে। তখন অসংখ্য প্রাণী ভয় পেয়ে ইন্দ্রের কাছে ছুটে গিয়ে তাদের বাঁচাতে বলল। ইন্দ্র ভীষণ রেগে কুম্ভকর্ণের উপর বজ্রায়ুধ প্রয়োগ করলেন। কুম্ভকর্ণ সিংহনাদ করে উঠল। সেই ধ্বনি শুনে প্রাণীগণ আরও ভয় পেল। কুম্ভকর্ণ ঐরাবতের একটি দাঁত টেনে নিয়ে ইন্দ্রের বুক বিদ্ধ করল। তখন ইন্দ্র প্রাণীগণকে নিয়ে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে অভিযোগ করলেন। ব্রহ্মা সমস্ত রাক্ষসদের ডেকে পাঠালেন। ওদের মধ্যে কুম্ভকর্ণকে দেখে স্বয়ং ব্রহ্মাই ভয় পেয়েছিলেন। ব্রহ্মা তাকে বললেন, 'জগৎ সংসারের প্রাণীগণকে বিনাশ করার জন্যই কি বিশ্রবস্ তোমায় জন্ম দিয়েছে? যাও তুমি অনন্তকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়। যাও ঘুমোও। তোমার গভীর নিদ্রা হোক।' ব্রহ্মার অভিশাপ সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরী হল। সেখানেই কুম্ভকর্ণ ঘুমিয়ে পড়ল। সেটা দেখে রাবণ ব্রহ্মাকে বলল, 'আপনার নাতিকে আপনি এই ধরণের অভিশাপ দিয়ে ভালো করেননি। আপনার কথা নড়চড় হয়না। আপনার অভিশাপ ফলবতী হয়। কুম্ভকর্ণ ঘুমোক, কিন্তু তার ঘুমোনোর একটা সময় আপনি বেঁধে দিন। সারা জীবন যদি ঘুমিয়েই থাকে তাহলে ওর জন্মের সার্থকতা কি!'' তখন ব্রহ্মা বললেন, 'কুম্ভকর্ণ টানা ছমাস ঘুমোবে আর একদিন জাগবে। ঘুম ভাঙ্গার পর সে সামনে যা পাবে তাই অগ্নিহোত্রের মত খাবে।'' তারপর থেকে কুম্ভকর্ণ ছমাস ঘুমোয়, একদিন জাগে······আপনার পরাক্রম দেখে

রাবণ ভয় পেয়ে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গাল। মহাপরাক্রমশালী কুম্ভকর্ণ বানরদের খাও-য়ার জন্য তেড়ে আসবে। যেসব বানর তাকে দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে তারা তাকে মারবে কি করে। বানরদের বুঝিয়ে বলতে হবে, ওটা কোন রাক্ষস নয়। একটি সচল যন্ত্র। বানররা অতবড় রাক্ষসকে ভয় করলেও যন্ত্রকে ভয় পাবেনা।

বিভীষণের কথা শুনে রাম খুশী হলেন। নীলকে সৈন্য সাজাতে বললেন। গবাক্ষ, সরভ, হনুমান, অঙ্গদ, প্রভৃতি পাহাড় পর্বতের শিখর নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল।

কুম্ভকর্ণ রাবণের কাছে এল। তার ঘুম ভেঙ্গেছে বটে, কিন্তু ঘুমের ঘোর কাটেনি। রাবণ তখন গালে হাত দিয়ে ভাবছিল। তার চোখে মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ ছিল। কুম্ভকর্ণকে দেখে রাবণ খুব খুশী হয়ে সিংহা-সন থেকে উঠে এসে তাকে গভীরভাবে জড়িয়ে ধরল। তারপর দুজন বসল। কুম্ভকর্ণ রাবণকে বলল, "কি হয়েছে? এমন কি হয়েছে যে আমার ঘুম ভাঙ্গাতে বললে? তোমার চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন কেন? যার জন্য তুমি এত ভীত তার দিন এগিয়ে এসেছে। এবার সে মরবে।"

রাবণ বলল, "তুমি ঠিক ধরেছ। আমি রামকে ভয় পাচ্ছি। রাম, সুগ্রীব আর বানরসেনা নিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে আমাদের বিনাশ করতে এসেছে। সারা লঙ্কায় অসংখ্য বানর ছড়িয়ে পড়েছে। লঙ্কায় যেদিকে তাকাও সেদিকেই বানর দেখতে পাবে। কদিন ধরেই যুদ্ধ চলছে। এক-দিনের যুদ্ধে একটিও বানর মারা যায়নি, কিন্তু অসংখ্য বীর রাক্ষসের মৃত্যু ঘটেছে। এখন তুমি সমস্ত বানরকে মেরে ফেলে লঙ্কাকে বাঁচাও। এ জন্যই আমি তোমার

ঘুম ভাঙ্গাতে বলেছি।"

কুম্ভকর্ণ হেসে বলল, "আমরা যেদিন তোমার সমালোচনা করেছিলাম সেদিন আমাদের কথা তোমার ভালো লাগেনি। সেদিন আমরা যা বলেছিলাম আজ তাই হাত চলেছে। সীতাকে অপহরণ করার ফলে যে পাপ হয়েছে সেই পাপের ফল তোমার সঙ্গে আমাদের সবাইকে ভোগ করতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে বিভীষণের কথা মত তোমার চলা উচিত ছিল। এখন তুমি কিকরতে চাও বল?"

রাবণ রেগে গিয়ে বলল, "আমার চেয়ে তুমি ছোট, তুমি আমাকে উপদেশ দিতে এসেছ? এখন বসে বসে আলোচনা করার সময় নয়। পরাক্রম প্রদর্শনের সময়।"

এই কথা শুনে কুম্ভকর্ণ বলল, "রাক্ষস-রাজা, আমি তোমার ছোট ভাই। বন্ধু হিসেবেও ধরতে পার। তোমাকে প্রয়োজন বোধে উপদেশ দেওয়া আমার কর্তব্য। না দিলে আমার কর্তব্য আমি পালন করতাম না। তুমি চাইছ ওদের মেরে ফেলতে। বেশ, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, আমি তোমার শত্রুদের মেরে ফেলবো। রাম লক্ষণকে মেরে ফেললেই বানরেরা পালিয়ে যাবে। ওরা পালিয়ে গেলে যেসব রাক্ষস মারা গেছে তার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব খুশী হবে। আমি বেঁচে থাকতে রাম তোমাকে মেরে ফেলতে পারবে না।"
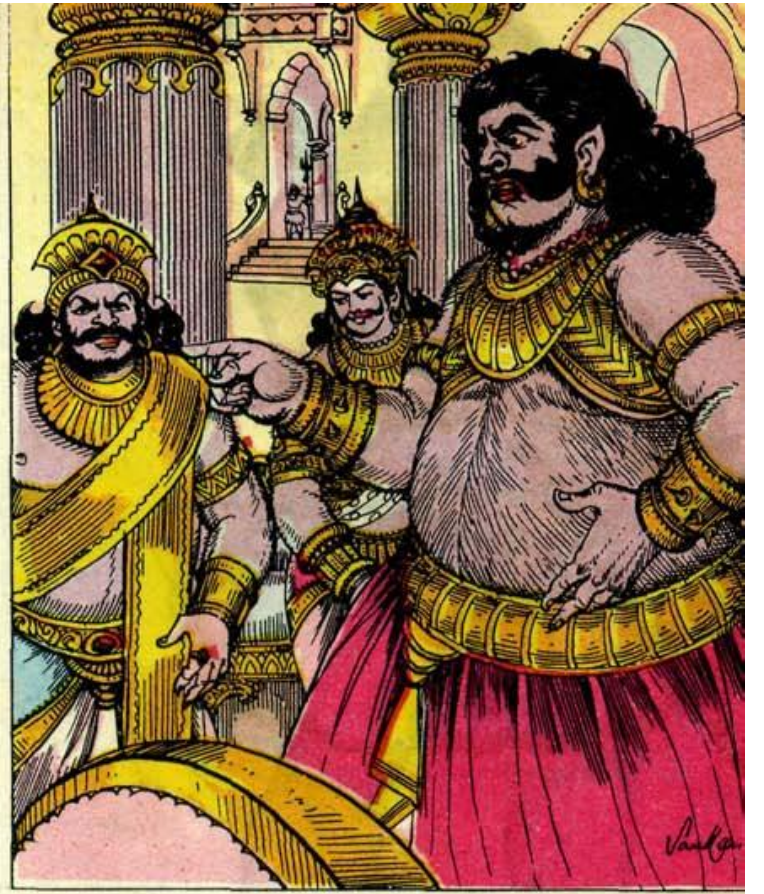
এতক্ষণ পরে মহোদর কুম্ভকর্ণকে বলল, "রাবণ যখন সীতাকে তুলে আনার পরিকল্পনায় মত্ত ছিল আমরা তখন বাধা দিইনি। কেউ কেউ মনে মনে খুশী হয়েছি। কারও কথা না শুনে রাবণ যে সীতাকে তুলে এনেছে এ কথা ঠিক নয়। তুমি নিজের পরাক্রম দেখানোর জন্য

একাই যুদ্ধে যাওয়ার কথা বলছ, সেটাও ঠিক হবে না। যে রাম অসংখ্য রাক্ষসকে মেরে ফেলতে পারে তাকে তুমি একা মেরে ফেলবে কি করে? যেসব রাক্ষস রামের মুখোমুখি হয়েছিল, যারা যুদ্ধে আহত হয়েছে। তারা রামের কথা শুনলেই ভয় পাচ্ছে।"

কয়েক মুহূর্ত থেমে মহোদর রাবণকে বলল, "যুদ্ধে আমাদের কয়েকজনের এক-সঙ্গে যাওয়ার উচিত। আমরা যদি রামকে মেরে ফেলতে পারি ভালো কথা, যদি না পারি ফিরে এসে প্রচার করব রামকে খেয়ে ফেলেছি বলে। এদিকে প্রচারটা জোর চালানো উচিত। সীতার কানে খবরটা ঠিকভাবে পৌঁছে গেলে যে উদ্দেশ্যে সীতাকে আনা সেই উদ্দেশ্য পূরণ হবে।"

মহোদবের কথা শুনে কুম্ভকর্ণের ভীষণ রাগ হল। সে মহোদরকে বলল, "এই ধরণের কথা কক্ষনো বলবে না। আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। যারা ভীরু, যাদের বুদ্ধি নেই তাদের কথা শুনে চলার ফলেই রাবণের আজ এই অবস্থা। যুদ্ধের নাম শুনেই তো তুমি ভয় পাও। যখন যা করা উচিত তখন তা করনি বলেই, রাজার নির্দেশ মত চলনি বলেই, আজ লঙ্কার এই দুরাবস্থা। খালি কথা বলেছ আর উপদেশ দিয়ে গেছ। কাজের কাজ কিছুই করনি। সেনাবাহিনীর মধ্যে হতাশা ছড়িয়েছ। তোমরা রাজার শত্রু না মিত্র বুঝতে পারছি না। তোমারা যে ভুল করেছ তার প্রায়শ্চিত্য স্বরূপ আমি যুদ্ধ-ভূমিতে যাচ্ছি।"

কুম্ভকর্ণের কথা শুনে রাবণ সশব্দে হেসে তাকে বলল, "মহোদর তো রামের নাম শুনেই ভয় পায়। আসলে সে যুদ্ধ

করতে চায় না। এখন আমার কাছে সবচেয়েও শক্তিশালী, সবচেয়ে কাছের রাক্ষস একমাত্র তুমি। সমস্ত দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। যুদ্ধে তোমাকে জয়ী হতেই হবে। বানররা তোমাকে দেখেই পালাবে। রাম লক্ষণ তোমাকে দেখলেই মূর্ছা যাবে।"

কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে যাবে ঠিক করল। ভালো শূল হাতে তুলে নিল। সেটি লোহার তৈরি। সোনার অলঙ্কার তাতে পরানো ছিল। সেই শূলে লাল ফুলেরমালা জড়িয়ে কুম্ভকর্ণ বলল, "একাই যাচ্ছি।" সেনাদের নিয়ে যাও। রাবণ বলল।

পথে কুম্ভকর্ণ রাক্ষসদের বলল, "বানররা আমাদের কোন ক্ষতি করেনি। যুদ্ধ হবে মূলত রাম লক্ষণের বিরুদ্ধে।

এই কথা শুনে রাক্ষসেরা হর্ষধ্বনি করল। কুম্ভকর্ণকে দেখেই বানরবাহিনী ছড়িয়ে পালিয়ে গেল। সেই দৃশ্য দেখে কুম্ভকর্ণ খুব খুশী হল।

অঙ্গদ বানরদের ঐ ভয়ার্ত ভাব দেখে নল, নীল, গবাক্ষ, কুমুদ প্রভৃতিকে বলল, "তোমরা তোমাদের নিজের শক্তি, পরাক্রম, বংশমর্যাদা সব কিছু ভুলে সাধারণ
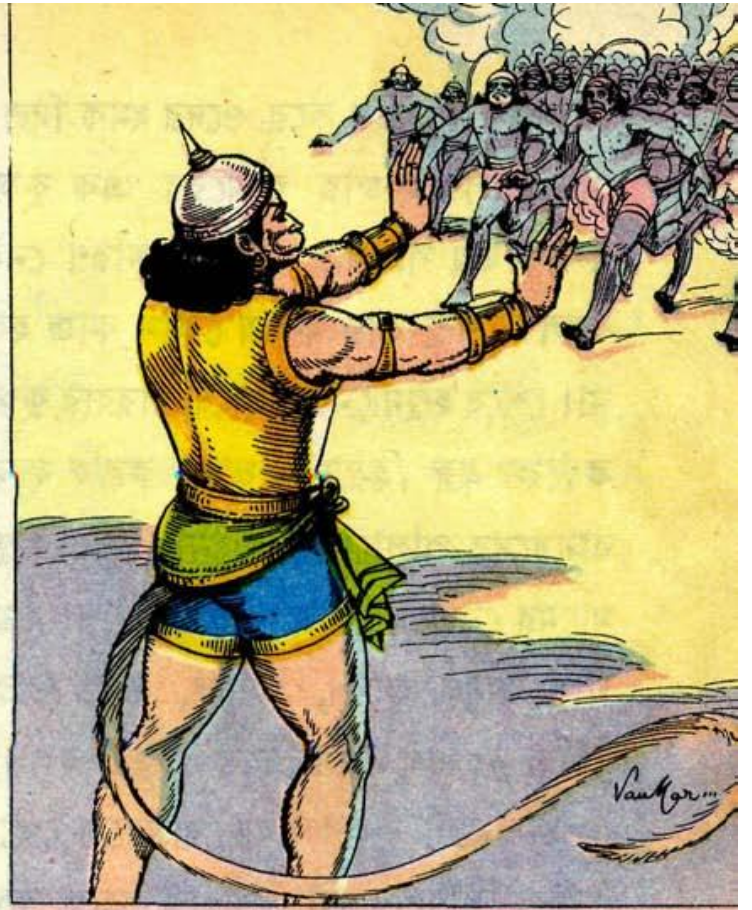
বানরের মত পালিয়ে যাচ্ছো কোথায়? সামনে যাকে দেখতে পাচ্ছ, সেটা কোন রাক্ষস নয়। ওটা নিছক একটা যন্ত্র।"

এই কথা শুনে বানরদের বুকে সাহস এল। ওরা গাছ আর পাথর নিয়ে যুদ্ধ ভূমির দিকে এগিয়ে গেল। হাতির উপর যেভাবে আক্রমণ করা হয় সেইভাবে কুম্ভকর্ণের উপর আক্রমণ করল। তবে ওদের ছুঁড়ে মারা গাছ আর পাথরের আঘাতে কুম্ভকর্ণের কিছুই হয়নি।

তারপর কুম্ভকর্ণ বানরদের এমন প্রচণ্ড আঘাত করল যে ওরা পালিয়ে গেল।

অঙ্গদ চিৎকার করে ওদের ধমক দিল। এত হাজার হাজার বানরের এক কুম্ভকর্ণকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই বলল। কিন্তু তার কথায় কোন কাজ হল না। শেষে হনুমানের সাহায্যে বারবার কুম্ভকর্ণকে যন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করার ফলে বানরদের পালানো থামানো গেল। হনুমানের নেতৃত্বে ঋষভ, শরভ, মৈন্দ, ধূম্র, নীল, কুমুদ, সুষেণ, গবাক্ষ, রম্ভ, তার, দ্বিবিদ, পণশ প্রাণ দিতে প্রস্তুত হল।

ইতিমধ্যে কুম্ভকর্ণ বহু বানরকে খেতে গেল। দ্বিবিদ একটা পাহাড় তুলে কুম্ভকর্ণের উপর ছুঁড়ে মারল। সেটা কুম্ভকর্ণের উপর না পড়ে তার সেনাদের উপর পড়ল। ফলে বহু সেনা মরে গেল। রথ ভেঙ্গে গেল, কিছু অস্ত্র ধ্বংস হল। এই ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে রাক্ষসদের দিকে ছুঁড়তে লাগল।

হনুমান অনেক উপরে উঠে গিয়ে আকাশ থেকে বড় বড় গাছ ও পাহাড় কুম্ভকর্ণের উপর ফেলতে লাগল।

ফলে কুম্ভকর্ণের শরীরে আঘাত লাগল। তার গা বেয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। সে শূলটাকে হনুমানের দিকে ছুঁড়ল। হনুমানের বুকে ঐ শূল বিদ্ধ হল। তার বুক থেকে রক্ত ঝরতে লাগল।

এমন সময় নীল কুম্ভকর্ণের উপর একটি পাহাড় ছুঁড়ে মারল। সেটাকে কুম্ভকর্ণ হাত ধরে গুড়ো করে ফেলল। তারপর ঋষভ, সরভ, নীল, গবাক্ষ ও গন্ধমাদন এই পাঁচজন একসঙ্গে কুম্ভকর্ণের উপর আক্রমণ চালাল। ওদের আক্রমণের ফলে কুম্ভকর্ণ আহত হওয়া তো দূরের কথা সে সুখ পাচ্ছিল। তারপর সে শুরু করল ওদের উপর আক্রমণ। কুম্ভকর্ণের আক্রমণের ফলে ওরা ধরাশায়ী হল।

বাজী প্রভু

দিল্লীর সিংহাসনে আসীন মুঘল সম্রাটের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন মারাঠার মহাবীর শিবাজী। তিনি মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে মস্তবড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

সময়টা ছিল ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ। শিবাজী তখন পান্হালা দুর্গে ছিলেন। তাঁর সেনাবাহিনী সহ তাঁকে বন্দী করার জন্য বিজাপুরের সুলতান সলাবৎ খাঁন কিছু সৈন্য পাঠিয়েছিল। অনেকদিন ধরে শিবাজীর বিরুদ্ধে ওদের যুদ্ধ হল।
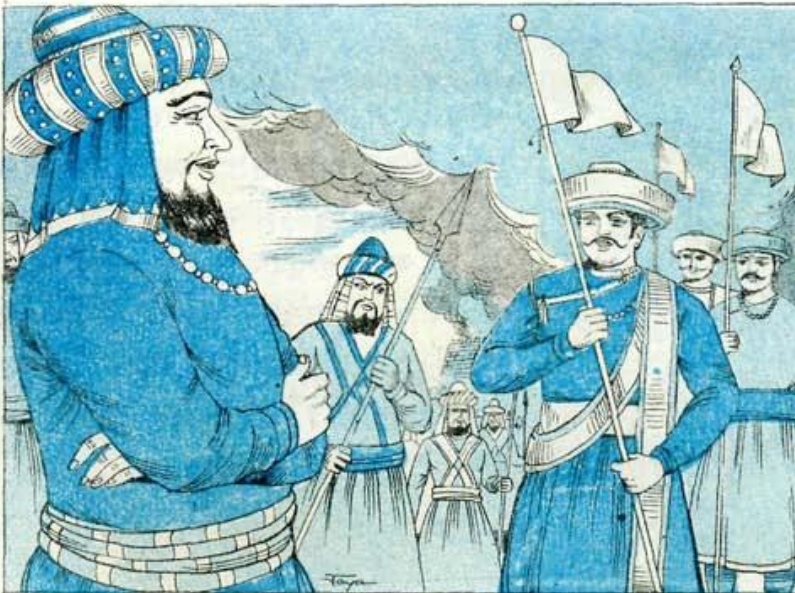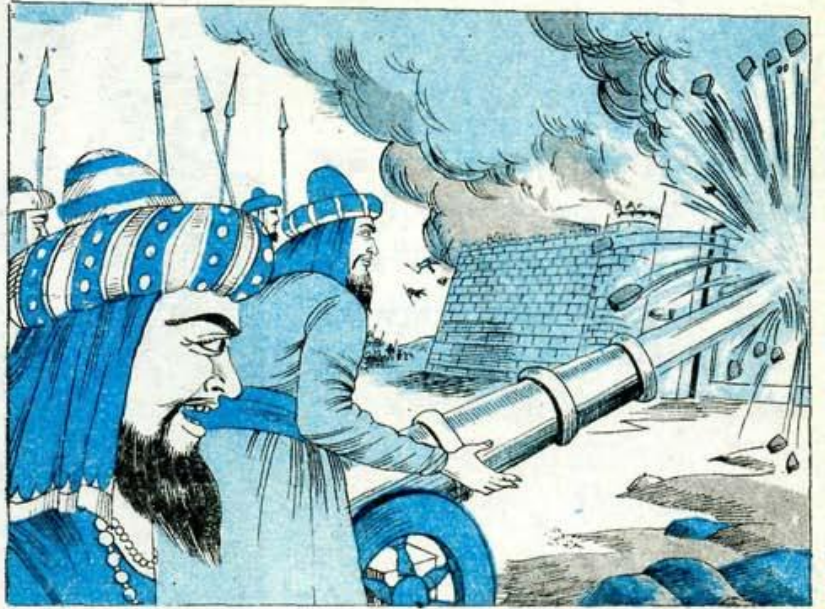
একদিন শিবাজীর কিছু সৈনিক সাদা পতাকা হাতে নিয়ে দুর্গের দরজায় এসে সন্ধির কথা ঘোষণা করল। সেখানে ওরা সলাবৎ খাঁন-এর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করল।

অমর বাণী

অর্থেভ্যো হি বিবৃদ্ধেভ্যঃ,
সংবৃত্তেভ্য স্তত স্ততঃ
কৃয়াস্‌সর্বাঃ প্রবর্তন্তে
পর্বতেভ্য ইবাপগাঃ। ॥ ১ ॥

[নদী যেমন পর্বত থেকে জন্মগ্রহণ করে ধর্ম কার্যাবলীও তেমনি ধন থেকেই বৃদ্ধি পায়।]

অর্থেন হি বিযুক্তস্য
পুরুষ স্যাল্প তেজসঃ
ব্যুচ্ছিদ্যন্তে কৃয়াস্‌ সর্বা
গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা। ॥ ২ ॥

[গ্রীষ্মকালে ছোট ছোট নদী যেমন শুকিয়ে যায় তেমনি ধনহীনের ক্ষমতাও কমে গেলে তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।]

সোয়মর্থম্‌ পরিত্যজ্য
সুখ কামস্‌ সুখৈধিতঃ,
পাপ মারভতে কর্তুম্‌,
ততো দোষঃ প্রবর্ততে। ॥ ৩ ॥

[ধনহীন ব্যক্তি সুখীজীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়ায় পাপ কাজ শুরু করে, অধর্মের পালক সে হয়।]

শিবাজীর লোক সলাবৎ খাঁ-এর সঙ্গে যখন আলোচনা করছিল তখন শিবাজী বৃদ্ধের বেশ ধরে কয়েকজন বীর অনুচরকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন। অদূরেই শিবাজী ও তার অনুচরদের নিয়ে যাওয়ার জন্য ঘোড়া প্রস্তুত ছিল।

সেখানে গিয়ে শিবাজী এবং তাঁর অনুচরগণ নিজেদের ছদ্মবেশ খুলে ঘোড়ার পিঠে উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর গুপ্তচর ওদের দেখে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে খবর পেয়ে সলারৎ খাঁন ওদের অনুসরণ করল।

তাড়াহুড়ো করে ঘোড়া বাছাই করার ফলে শিবাজী ও তার অনুচরদের জন্য খুব ভালো ঘোড়া বাছাই করা গেল না। ফলে সলাবৎ খাঁ ও তার অনুচরগণ কিছুক্ষণের মধ্যেই শিবাজীর কাছে পৌঁছে গেল। উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হল। তবে সেই যুদ্ধে সহজেই শিবাজী জয়ী হলেন।

শিবাজীর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে বাজীপ্রভুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তিনি শিবাজীর বন্ধুও ছিলেন। যুদ্ধের শেষে হঠাৎ তিনি শিবাজীকে গোপনে বললেন, "এখন সলাবৎ খাঁন হেরে গেলেও কিছু-ক্ষণের মধ্যে তার অসংখ্য সেনা এসে

আমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আমাদের এক্ষুনি অতি দ্রুত পাহাড়ের দিকে চলে যাওয়া উচিত।" তার কথাই সত্য হল। সলাবৎ খাঁন বহু সেনা নিয়ে সেখানে আবার হাজির হল। বাজী ভালোভাবে বুঝিয়ে শিবাজী যাতে বিশালগড়ের দুর্গে চলে যান তার ব্যবস্থা করলেন। নিরাপদে সেখানে

পৌঁছে যাওয়ার পর তিনি যাতে ধ্বনি দিয়ে ইশারা করেন তাও জানিয়ে ছিলেন।

শিবাজীকে পাঠিয়ে দিয়ে বাজী তাঁর কয়েকটি সৈন্য নিয়ে শত্রুপক্ষের অতবড় বাহিনীর বিরুদ্ধে নানা কৌশলে যুদ্ধ

করতে লাগলেন। সেই সময় তিনি এমন সব কৌশল অবলম্বন করলেন যার ফলে শত্রুপক্ষের বহু সেনা পাহাড়ের আনাচে কানাচে ঢুকে মৃত্যুর মুখে পতিত হল।

এইভাবে তাঁর নেতা শিবাজী যাতে নিরাপদে বিশালগড়ে পৌঁছে যান তার সুযোগ সৃষ্টি করলেন তিনি। শত্রুপক্ষের

সেনারা বাজী ও তার সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এত ব্যস্ত ছিল যে শিবাজীকে ধরা বা পর্যুদস্ত করার কথা তাদের সেই মুহূর্তে মনে পড়েনি। শেষে শিবাজীর ধ্বনি সংকেত শুনে বাজী নিশ্চিন্ত হলেন।
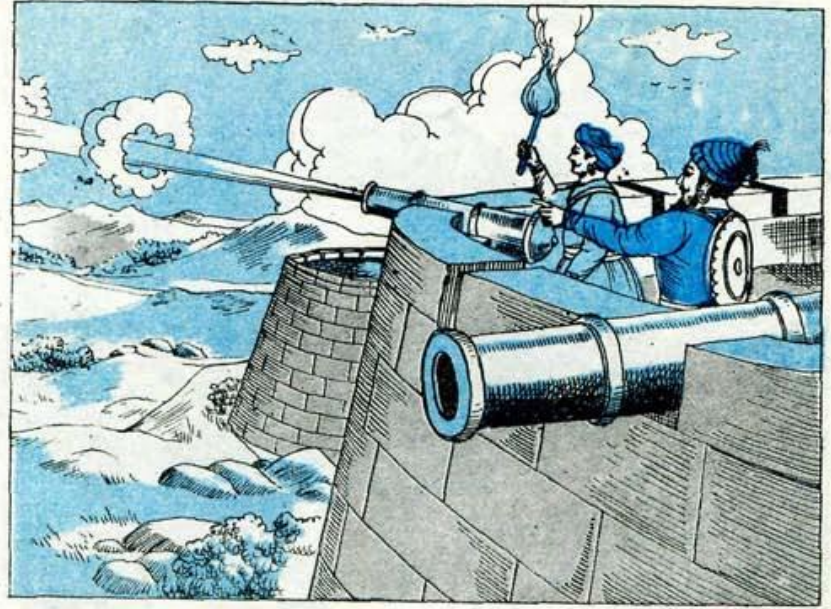
বহু সৈন্যকে পাহাড়ের গহ্বরে হারিয়ে হতাশ হয়ে ততক্ষণে শত্রুসৈন্য পিছু হটেছিল। তবে ঐ যুদ্ধে বাজী প্রভু ভীষণভাবে আহত হলেন। আহত অবস্থাতেই তিনি বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন। সেই আঘাতের ফলেই তাঁর মৃত্যু ঘটল। তাঁর মৃত্যু ঘটলেও তিনি আজও শিবাজীর রক্ষাকারী বীর দেশপ্রেমিক হিসাবে দেশবাসীর ইতিহাসে হয়ে আছেন অমর।

গল্পের নামকরণ প্রতিযোগিতা

এই গল্পের ভাল নাম দিয়ে ২৫ টাকা জিতে নিন

?

এক ছিল কিপ্‌টে লোক। পেটভরে খেতো না, এমন কি একমাত্র ছেলেকেও খেতে দিত না। বাপের কিপ্‌টেমির জন্য ছেলেকে খুব কষ্ট পেতে হত। তার মাথার চুল বেড়ে গেলে, চুল ছাঁটার পয়সাও ঐ লোকটা ছেলেকে দিতো না। চুল কাটাতে এক আনাও বাপ দিতো না। বন্ধুরা তাকে "সাধু" বলে ক্ষ্যাপাত।

একদিন বাড়ির খিড়কির দরজার দিকের নারকেল গাছ থেকে একটা নারকেল পড়ে গেল। সেটা ছেলের নজরে পড়ল। সে ঐ নারকেলটা নাপিতকে দিয়ে বলল, "এই নারকেলটা নিয়ে আমার চুল কেটে দেবে?"

নাপিত তার বাবাকে চিনত। তাই সে নারকেল নিয়ে চুল ছেঁটে দিল। বাপ তাকে জিজ্ঞেস করল, "চুল ছেঁটে এলি, পয়সা পেলি কোথায়?"

"একটা নারকেল নাপিতকে দিয়ে চুল ছেঁটে এসেছি।"

"সে কি রে! ঐ নারকেলটা বিক্রি করলে তো এক আনা ঘরে আসত! তুই তো আমার সর্বনাশ করে দিলি। তাহলে আর আমি কার জন্যে এত কিপ্‌টেমি করছি!" বলে ঐ লোকটা কুড়ি বছর ধরে যে শাল যত্ন করে বাক্সে পুরে রেখেছিল সেটা ছেলেকে দিয়ে বলল, "আজ থেকে এটা গায়ে দাও। না দিলে, মারব।"

* * *

এই গল্পের ভালো নাম পোস্টকার্ডে লিখে পাঠাতে হবে। কার্ডের উপরে 'গল্প-নামকরণ প্রতিযোগিতা' লিখতে হবে। কার্ড পাঠানোর ঠিকানা:

Chandamama (Bengali), 2 & 3 Arcot Road, Madras-600 026

পোস্টকার্ড ২০শে জানুয়ারীর মধ্যে পৌঁছানো চাই। এই কার্ডে ফটো নামকরণ লেখা চলবে না। ফলাফল মার্চ '৭৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

জানুয়ারী '৭৭ গল্প-নামকরণ প্রতিযোগিতার ফলাফল

গল্পের নাম: কেউ কম যায় না

পুরস্কার পেয়েছেন: অরুণ ভট্টাচার্য্য, উত্তর ঘোষপাড়া, চাকদহ, নদীয়া।

ফটো-নামকরণ প্রতিযোগিতা ঃঃ পুরস্কার ২৫ টাকা

পুরস্কৃত নাম মার্চ '৭৭-এর সংখ্যায় প্রকাশিত হবে

★

ফটো নামকরণ ছু'চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং ছুটো ফটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই।

২০শে জানুয়ারী '৭৭-মধ্যে পৌঁছানো চাই। তার পরে পৌঁছানো চিঠি গ্রহণযোগ্য হবে না।

জয়ী প্রতিযোগীকে ঐ ছুটো নামের জন্য মোট ২৫ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। ছুটো ফটোর নামকরণ একমাত্র পোস্টকার্ডেই লিখে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কার্ডে অন্য কোনো বিষয় লেখা চলবে না।

Chandamama Photo Caption Competetion, Madras-26

জানুয়ারী '৭৭ ফটো নামকরণ প্রতিযোগিতার ফলাফল

প্রথম ফটোর নাম ঃ হৃদয়ে আছে ভক্তি দেব

দ্বিতীয় ফটোর নাম ঃ মন্দির ভাবে আমি দেব

পুরস্কার পেয়েছেন ঃ পুলক দাস, অমরাবতী, সোদপুর, ২৪ পরগণা।

পুরস্কারের ২৫ টাকা এই মাসের মধ্যে পাঠানো হবে।

Printed by B. V. REDDI at Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for CHANDAMAMA CHILDREN'S TRUST FUND (Prop. of Chandamama Publications) 2 & 3, Arcot Road, Madras 600 026 : Controlling Editor : NAGI REDDI

চাঁদমামার গ্রাহকদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

আপনি যদি নিজের ঠিকানা বদলাতে চান তাহলে পাঁচ তারিখের মধ্যে গ্রাহক সংখ্যাসহ আপনার নতুন ঠিকানা আমাদের জানান। দেরি করলে পরের মাস থেকে নতুন ঠিকানায় 'চাঁদমামা' পাঠাব। আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

ডলটন্ এজেন্সীস
চাঁদমামা বিল্ডিংস
মাদ্রাজ-৬০০ ০২৬

দেশ এগিয়ে চলেছে

নানা-দিকে বিদ্যুৎশক্তির অগ্রগতি

1974 সালে আমাদের বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা 1 কোটি 90 লক্ষ কিলোওয়াটে পৌঁছেছে। 1947 সালে এই ক্ষমতার পরিমাণ ছিল মাত্র 13 লক্ষ কিলোওয়াট।

আজ 1.5 লক্ষ গ্রামে বিদ্যুৎ-সঞ্চার করা হয়েছে; ক্ষেত-খামারে 24 লক্ষ 40 হাজারটি পাম্প-সেটকে বিদ্যুৎশক্তিপূর্ণ করা হয়েছে। চলতি বছরে অতিরিক্ত 26 লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি যোগ করা হবে।

দৃঢ় সংকল্প ও
কঠোর পরিশ্রম আমাদের
এগিয়ে নিয়ে যাবে

davp 75/449

মিত্রলাভ

মিত্রলাভ

একচল্লিশ

হিরণ্যক (ইঁদুর) মন্দরককে দৈবাধীনের কাহিনী বলে শেষে বলল ঃ বৃহস্পতি চূড়াকর্ণকে বলল, "দেখলে তো বন্ধু, যে মুহূর্তে তার সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে গেছে সেই মুহূর্তে তার শক্তিও লোপাট হয়ে গেছে। নিশ্চিন্তে ঘুমাও।"

এই কথা শুনে আমি রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম। কারণ ওর ওই কথার মধ্যে সত্য ছিল। ঘর-বাড়ি, সম্পত্তি এগুলো না থাকলে সত্যি শক্তি কমে যায়। আগের মত ঐ ঘরে আমার খাদ্য পাওয়ার আশাও আর রইল না। আমার সঙ্গী সাথীরা আমাকে বলাবলি করল, "এতো আমাদের জন্য দূরের কথা নিজের জন্যও খাদ্য জোগাড় করতে পারছে না। এর আশ্রয়ে থেকে কি লাভ?"

তারপর আমি ঠিক করলাম আর সেখানে থাকা ঠিক নয়। কারণ সেখানে আমার মান সম্মান থাকত না। যেখানে সম্মান থাকে না সেখানে থাকার কোন মানে হয় না। তাই আমি আমার পুরানো আশ্রয়ে চলে গেলাম। অরণ্যে ঢুকলাম। সেখানে একবার জালে আটকে পড়েছিল চিত্রগ্রীব। সেই জাল কেটে আমি যে তাকে মুক্ত করেছিলাম সেই কাহিনী আমি তোমাকে আগেই বলেছি। তারপর লঘুপতনক আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে আমাকে এখানে আসতে বলল। তাই এখানে তোমাকে দেখতে এসেছি।

মন্দরক এই কাহিনী শুনে বলল,

শেষ প্রচ্ছদ চিত্র

“দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। সমিলক যেভাবে শেষপর্যন্ত ভাগ্যকে জয় করে জয়ী হতে পারল তুমিও হতে পারবে।”

“কই, সে কাহিনী তো আমি শুনিনি?” লঘুপতনক বলল।

মন্দরক শুরু করে দিল সেই কাহিনী ঃ

সমিলক নামক তাঁতীর কাহিনী

সমিলক ভালো তাঁতী ছিল। নিপুণ কাজ করত। রং বেরংএর কাপড় বোনার কাজ সে করত। তার বোনা কাপড় দেখে মনে হত রাজার পোশাক। এত দক্ষ কারিগর হওয়া সত্ত্বেও তার কোন রকমে পেট চলত। সাধারণ তাঁতীরা তার চেয়ে অনেক বেশী রোজগার করত। এসব দেখে সে বউকে বলল, “দেখ, মোটা মোটা কাপড় যারা বোনে তারা অনেক পয়সাকড়ি জমাতে পেরেছে। যে দেশে এতটা অবিচার হচ্ছে সে দেশে আর থাকতে ইচ্ছে করছে না। চল আমরা কোথাও চলে যাই।” এই কথা শুনে তার বউ বলল, “দেখ, এখানে যা পাচ্ছ না তা তুমি অন্য দেশেও পাবে না। এখানে থেকে যা পাও তাতেই সুখী থেকো। এখানে তোমার সব হবে।”

“দেখ বউ, তুমি যা বলছ আমার তা বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার মন বলছে, এতদিনে যখন কিছু হয় নি তখন আর হবেও না। কপালে সৌভাগ্যের ইঙ্গিত থাকলেও আমাদের চেষ্টা ছাড়া সেই সৌভাগ্যের দরজা খুলে যেতে পারে না। যারা ভাগ্যের নামে বসে থাকে তারা কাপুরুষ। তাই বলছি, এসো আমরা অন্য কিছু করে, অন্য কোথাও গিয়ে ভাগ্যের হেরফের হয় কি না দেখি। চেষ্টা করে যদি ব্যর্থ হই তখন সান্ত্বনা থাকবে। সিংহকেও বেরোতে হয়, শিকার করতে

হয়। তবে সে পেট ভরাতে পারে। তাই ভাবছি কোথাও চলে যাবো।"

তারপর সে বর্ধমানপুর চলে গেল। সেখানে তিন বছর পরিশ্রম করে তিনশ স্বর্ণমুদ্রা জমিয়ে নিজের গ্রামে ফিরল। ফেরা পথে তাকে অরণ্য পেরোতে হল।

ঐ অরণ্য পথে যেতে যেতে সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার হয়ে গেল। সেই অন্ধকারে তার হাঁটতে ভয় করল। সে তখন একটা বটগাছে উঠে মোটা শাখায় ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমোতে ঘুমোতে সমিলক স্বপ্ন দেখল। দুটো লোক রক্তচক্ষু করে একে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করছে।

একজন অন্যজনকে বলছে, "দেখ কর্তা, সমিলক যাতে নিজের জায়গা ছেড়ে অন্যত্র না যায় তার জন্য আমি বাধা দিয়েছি। সেখানে তুমি তার হাতে পয়সা দিলে না। এখন সে তিনশ স্বর্ণমুদ্রা কি করে জমাল?"

দ্বিতীয় জন প্রথম জনকে বলল, "শোন কর্ম, সমিলককে আমিও বাধা দিয়েছিলাম। সে যাতে বেশী পয়সা না পায় সেদিকে আমি লক্ষ্য রেখেছি। কাজ দেখে ফল দেওয়া আমার ধর্ম। সেটা যদি তুমি না চাও তুমি ওর কাছে যা আছে নিয়ে নাও।"

এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে সমিলকের ঘুম ভেঙ্গে গেল। যে থলিতে স্বর্ণমুদ্রা রেখেছিল সেই থলি হাতড়ে দেখল, তাতে কিছু নেই। তখন সে মনে মনে বলল, "এত কষ্ট করে আমি যা রোজগার করেছি তা কোথায় গেল? বাড়ি ফিরে বউ, বন্ধুদের কি দেখাব? ফিরব না।"

তারপর আবার সে বর্ধমানপুরে গেল। টানা এক বছর কঠোর পরিশ্রম করে পাঁচশ স্বর্ণমুদ্রা জমাল।